

মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত



সাংবাদিকতার পেশা একজন সৎ, অনুসন্ধানী, পেশাদার সাংবাদিক সমাজের নানাস্তরের মানুষের কাছে যেমন পৌঁছে দেয়, তেমনি একটা দেশের রাজনৈতিক তথা সামাজিক ইতিহাসের কেন্দ্রেও এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ছয়ের দশক থেকে সাংবাদিক হিসেবে যে কর্মজীবন আমি কাটিয়েছি তার সূত্রে আমি ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ নামে একটা দেশ এবং রাজ্যের বহু রাজনৈতিক ওঠাপড়ার যেমন তেমনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশ নামে নবজন্ম নেওয়া একটা নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেরও সাক্ষী। পেশার সূত্রেই অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেনদের মতো স্বাধীনতা উত্তর যুগের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কর্ণধারদের আমলে আমার দেখা ও সাক্ষী থাকা বহু ঘটনাই যেমন এ বইতে এসেছে, তেমনি এসেছে সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অংশীদার হয়ে পড়া বহু ঘটনার রিপোর্ট করার অন্তরঙ্গ কাহিনি। একদিকে যেমন এসেছে ইন্দিরা গান্ধীর মতো একজন বড় মাপের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সান্নিধ্যের কথাচিত্র, তেমনি একজন রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসেবে আবু বরকত গনি খান চৌধুরী, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, জ্যোতি বসুদের মতো মানুষদের অন্তরঙ্গভাবে দেখা এবং তাঁদের সূত্রে সেই সময়কার উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমি বহু সাধারণভাবে না-জানা ঘটনার পশ্চাৎপটও।



ISBN : 978-984-91335-2-0



এই বইতে একদিকে যেমন এখানে রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্নের রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলোর সঙ্গে বাংলাভাষার অন্যতম একটি দৈনিকের সমর সংবাদদাতা হিসেবে জড়িয়ে থাকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তেমনি আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন দেশনায়কের কাছাকাছি হবার সূত্রে সাক্ষী থাকা বহু আবেগমথিত অভিজ্ঞতাও। আছে লিবারেশন সরকারের চার প্রধানকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা। এসেছে পশ্চিমবঙ্গে গত শতকের ছয়-সাতের দশকের উত্তাল সময়পর্বের কথাচিত্রের পাশাপাশি জরুরি অবস্থা চলাকালীন এই রাজ্যের সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পরবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মনমোহন সিংহের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে সাক্ষী থাকা বহু ঘটনাও...দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে যার প্রতিটিরই অনুপুঙ্খ প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে আমাকে। এক অর্থে এ কেবল একজন সাংবাদিকের চোখে দেখা ঘটনার নেপথ্য বিবরণমাত্র নয়, এ হলো দুটি দেশের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন টালমাটাল পর্বের অন্তরঙ্গ কথাচিত্রও। অন্যদিকে এ হল এশিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের দীর্ঘ ছয় দশক ব্যাপী ইতিহাসেরও অন্তরঙ্গ বিবরণ... যার শেষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে।

প্রচ্ছদ ■ সোহেল আনাম



মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রকাশক
খন্দকার মনিরুল ইসলাম
ভাষাচিত্র ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০, মুঠোফোন : ০১৯৬৭ ৪০৪০৪০, ০১৭১১ ৩২৪৬৪৪
প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭৮, কলকাতা
প্রথম ভাষাচিত্র সংস্করণ একুশে বইমেলা ২০১৫

প্রচ্ছদ সোহেল আনাম
মুদ্রণ টিমওয়ার্ক
মূল্য ৩০০ টাকা

MUJIB HOTTAR SHOROJONTRO
A Non Fiction by Sukharanjan Dasgupta
First Bhashachitra Edition : February 2015
Published by **BHASHACHITRA**
Islami Tower (2nd Floor), 11 Banglabazar, Dhaka 1100
Cell : 01967 404040, 01711 324 644

E-mail : bhashachitra@gmail.com

PRICE : TK 300 US $ 20

ISBN : 978-984-91335-2-0

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন
তাঁদের উদ্দেশে

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর আমি প্রথম ইংরেজিতে যে বইটি লিখেছিলাম 'মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা' নামে, তা বাংলাসহ ছ'টি আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি সংস্করণটি প্রকাশ করেছিল দিল্লির ইউবিএস। আর বাংলায় 'মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র' প্রকাশ করে কলকাতার আনন্দ পাবলিশার্স।

সম্ভবত মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র নিয়ে পৃথিবীতে এটিই প্রথম বই। প্রকাশিত হওয়ার পর লন্ডনের বিখ্যাত সাংবাদিক টনি ম্যাসকারনাম একটি বই লেখেন। তারপর অবশ্য বিশ্বে মুজিব-হত্যা নিয়ে অনেক বই বেরিয়েছে। বেশ কয়েকটি পড়েছি। সেগুলি আসল ঘটনা থেকে সরে গিয়েছে বলে আমার ধারণা। আমার বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে সেটি নিষিদ্ধ করেন। আমার বাংলাদেশ সফরও নিষিদ্ধ করা হয়। আট-এর দশকের গোড়ায় দিল্লিতে এসে তিনি 'আনন্দবাজার'-এর সম্পাদক অভীক সরকারের সঙ্গে দেখা করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগও করেন। তিনি যদি সত্যিই ষড়যন্ত্রের নায়ক না হতেন তাহলে বইটি তিনি নিষিদ্ধ করে দিলেন কেন? বিতর্কে যাব না।

২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ঢাকার অন্যতম মুখ্য দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এর নির্বাহী সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান ভারতে নির্বাচন কভার করতে আসেন। তিনি দিল্লিতে খোঁজ নেন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কার সঙ্গে কথা বলবেন। কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় বসে আলোচনা হয়। পরে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার দিন ফোন করে আমার বাড়ি চলে আসেন দুই সহকর্মীকে নিয়ে। যাবার সময় আমার বইয়ের একটি কপি নিয়ে গিয়েছিলেন পড়ার জন্য। পরে দেখলাম, ওই বইয়ের কিছু অংশ তাঁদের পত্রিকায় তিনি ছেপেছেন। এরপর তিনিই এক সকালে ফোন করে জানান ওই লেখার দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

পীর হাবিবুর রহমান যে কত বড় মাপের সাংবাদিক তা ওঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এরপর ঢাকা গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'একটি নতুন অধ্যায় যোগ করে বইটি আবার ছাপা দরকার। আপনি লিখুন।' তারপর তিনি মাঝে-মধ্যেই তাগাদা দিতে থাকেন।

প্রায় ৩৭-৩৮ বছর পর কার্যত জন্মস্থানের টানে আমার জন্মস্থানে গিয়েছিলাম। আমি যে ঢাকায় যাচ্ছি এই খবর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর

রহমান জানতে পেরেছিলেন। তিনি আমাকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তুমি মুক্তিযোদ্ধা। তুমি বাইরে উঠেছ কেন?' সেই সময়ে ঢাকা ক্লাবে পুরনো আমলের মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে সংবর্ধনাও দিয়েছিলেন।

ঢাকায় অনেকেই বলেছেন, 'আপনি এত কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন, আমরা তখনও জন্মাইনি।' এমনকি প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী দীপু মনির তখন বয়স ছিল আট বছর। তিনি আমাকে দিয়ে জোর করে বক্তৃতা করিয়েছিলেন। জিল্লুর ভাইকে কথা দিয়েছিলাম, পরেরবার বাংলাদেশ গিয়ে তাঁর বাড়িতেই উঠব। কিন্তু যখন ঢাকা যাই, তখন তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডনে। এর কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান।

এই বই প্রকাশের জন্য আমি সাংবাদিক পীর হাবিবুর রহমানের কাছে ঋণী। তাঁর উদ্যোগেই এটা প্রকাশ সম্ভব হল। আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই *বাংলাদেশ প্রতিদিন*-এর সম্পাদক নঈম নিজামকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বইটি পৌঁছে দিতে পেরে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত
নভেম্বর ২০১৪

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার ইংরেজি বই 'মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা'– মুজিব হত্যার নেপথ্য কাহিনি কেন এত দেরি করে বেরোল, সে প্রশ্ন অনেকে করেছেন। প্রশ্নটি সঙ্গত।

আমার নিবেদন : এজন্য দায়ী আমি নই, দায়ী এদেশের জরুরি অবস্থা। উনিশ শ' পঁচাত্তরের পনের আগস্ট মধ্যরাত্রে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। তার আগেই এখানে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। মুজিব-হত্যার সময় থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার হয়ে বাংলাদেশের যত সংবাদ সংগ্রহ করেছি, সেসব কর্তৃপক্ষ তার একটিও ছাপতে দেননি। এ ব্যাপারে কড়াকড়িটা পশ্চিমবঙ্গেই বেশি ছিল এবং তারও কারণ যে এখানকার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পরে তা প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি মুজিব-হত্যার তিনদিন পর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে আমি, বরুণ সেনগুপ্ত এবং অপর দুজন সহকর্মীর সঙ্গে ঢাকা যাবো বলে ঠিক হয়। সেইদিনই গভীর রাত্রে সিদ্ধার্থশঙ্করের গোয়েন্দা পুলিশ চারজনেরই বাড়িতে হানা দিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট কেড়ে নেয়। বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জঙ্গী সরকার যেমন কিছুতেই ভিসা দেয়নি সেখানে যেতে, তেমনি সংবাদ সংগ্রহে বারংবার বাঁধা পেয়েছি এখানকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। দেরি হলো তাই।

তবু সাংবাদিককে রোখা যায় না। চাপা যায় না সত্যকে। জরুরি অবস্থা উঠে গেছে। পট পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশেও। উনিশ শ' সত্তর-একাত্তর থেকেই বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে। দেরিতে পরিশ্রমটা কিছু বেশি হলেও সংবাদ সংগ্রহে আটকায়নি।

মুজিবের হত্যাকারী মেজররা লন্ডনে গিয়ে বলে, 'খুন করেছি, বেশ করেছি।' ওই মেজররা এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে জল্লাদ। তখন তারা জানতো না তা। পরে বোঝে, প্রাণ দিয়ে। এদের অনেকে নিহত, অন্যরা নির্বাসিত। অর্থাৎ মুজিব-হত্যার নেপথ্যে যে বিরাট চক্রান্তজাল তা দূরবিস্তৃত। এ এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। তারই নেপথ্য কাহিনি এই বই। ইংরেজিতে যাকে বলে ইনভেসটিগেটিং রিপোর্ট।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনবাংলা বেতার থেকে যিনি ঢাকার ভাষায় চরমপত্র পাঠ করতেন সেই বিখ্যাত মুকুল ভাই– এম. আর. আখতারের কাছে আমি

ঋণী। বর্তমানে লন্ডনে নির্বাসিত অবস্থায় থেকেও প্রচুর তথ্য পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে।

সহকর্মী কিশলয় ঠাকুরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা আমার সভ্রম ঘোষের কাছেও।

আমার স্ত্রী বিজলী দাশগুপ্তের সাহায্য, সহকারিতা ছাড়া এ বই লেখা সম্ভব হতো না। এজন্য আমি বিজলীর কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত
আগস্ট ১৯৭৮

১

চব্বিশ ঘণ্টা আগেই ইনশাআল্লা বলে ফানুশটি ছাড়লেন জিয়া। জঙ্গী-পোশাকটার উপরে গণতন্ত্রের ছাপমারা আলখাল্লা চাপিয়ে বাইরে এসে ঘোষণা করলেন : বাংলাদেশে গণতন্ত্র কায়েম করতে নয়া দলের অভ্যুদয় হল। এটা হল সামরিক আর সাধারণ মানুষের মিলজুল মোর্চা।

উনিশ শ' সাতাত্তরের পনের ডিসেম্বর, মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চবার্ষিক বিজয়দিবসের ঠিক আগের দিনের ঘটনা এটা।

পাঁচটি বছর আগে বাংলাদেশের মানুষ জীবনমূল্যে যে-মুক্তি অর্জন করেছিল, বারে বারে সন্ত্রাসে ষড়যন্ত্রে হত্যায় তা অবলুণ্ঠিত, মানুষ রুদ্ধশ্বাস, মাটি রক্তাক্ত। তবু প্রাণসত্তা নিঃশোষিত হয় না। হাওয়া শুঁকে-শুঁকে শঙ্কিত জিয়া হঠাৎ গদিকে চুমু খেয়ে গণতন্ত্রের ফুঁক দিলেন। আঠাশ মাস আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর থেকে প্রত্যেকটি ঘটনার দিকে শ্যেনদৃষ্টি রাখছিলেন তিনি। জেনারেল জিয়া বুঝতে পারছিলেন, বাংলাদেশের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজনীতি আর ক্ষমতা তাঁকে রাখতে হলে গণতন্ত্রের সঙ্গে ডিকটেটরির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা– চিরবিরোধী এই দুই জিনিসের নিকে ঘটাতে হবে। একদিন আগেই প্রধান সহকারী সামরিক আইন প্রশাসকের পদে ইস্তফা দিয়ে এয়ার ভাইস-মার্শাল এম জি মেহমুদ এসে জেনারেলের নয়া মোর্চার সম্পাদক হলেন। অভ্যুদয় হল বাংলাদেশে জিয়ামার্কা গণতন্ত্রের। সেঙাতরা বললে– মার হাব্বা!

কিন্তু গর্জে উঠলেন বেগম জোহরা তাজউদ্দীন। তিনি বললেন, ওটা জঙ্গীবাজদের পার্টি, খুনীদের দল। ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই গণতান্ত্রিক মানুষদের। তাঁর দাবি– নির্বাচন।

এ তাঁর একক কণ্ঠস্বর নয়। আয়ুব মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য, মুসলিম লীগ নেতা খান আবদুস সবুর খাঁও ওদের হুঁশিয়ারি দিলেনঃ শেখ মুজিবকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, এ কথা কেউ ভোলেনি। তোমাদেরও ক্ষমা নেই। স্বেচ্ছায় গদি ছাড়ো। না-হলে এই জনতা, যাদের নিরস্ত্র মনে করছ, তারাই তোমাদের হাত থেকে শাসনশক্তি ছিনিয়ে নেবে।

সবুর খানের এই হুঁশিয়ারি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, কেবল বঙ্গবন্ধু আর তাঁর পরিবারকেই নিশ্চিহ্ন করা হয়নি, ছারখার করা হয়েছে শত শত পরিবারকে। আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা-কর্মী, ছাত্র-শিক্ষক, এমনকি সামরিক অফিসারদের পর্যন্ত খতম করা হয়েছে। ছিন্নভিন্ন গণতন্ত্রের সনদ। পদদলিত গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক মূল্যবোধ। আর আশ্চর্য, সেই নিশান্ধকারে, মুজিব হত্যার পরবর্তী ঘটনাঘন দিনগুলিতে দেখা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদার-দাক্ষিণ্যে সাহায্য জুগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা সবার কাছেই একটা প্রশ্ন, একটা সন্দেহ জাগায়। তাহলে মুজিব-হত্যার পিছনে কি কোনো বিদেশি শক্তি ছিল? কে সে?

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি সাধ্যমত এ-সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করব।

মার্কিন-মদদ প্রথমদিকে যে-রকম পাচ্ছিলেন জিয়া, ক্রমে তা কমে এল। কারণটা সহজবোধ্য। বিদেশনীতিতে যে আমেরিকা মানবাধিকারের কথা বলে, কোন মুখে সে ভুলুণ্ঠিত মানবাধিকারের দেশকে সমর্থন করে? অবস্থাটা তার পক্ষেও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়।

একটা ফিকির ফাঁদলেন জিয়া সাহেব। তিনি যে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী তেমন একটা চেহারা আশপাশের দেশগুলিতে খোলতাই করতে হঠাৎ গেলেন নেপাল। আরও দুটো মতলব ছিল এই সফরের পিছনে। প্রথমত, নিজের দেশকে ধোঁকা দেওয়া– দেখছ তো, নেপাল আমার ডিকটেটরির পক্ষে। দ্বিতীয়টা একটা উপরি মুনাফার খোয়াব। ভারত সম্পর্কে নেপালের খুঁতখুঁতি যায়নি। এই সফরের চালে ভারত থেকেও বেশি সুবিধা-সুযোগ হাতানো যাবে।

এর একটিও হাসিল হয়নি। নেপাল সফরের পরেও জেনারেল জিয়া সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা বিদেশমন্ত্রীর মনোভাবের একচুল নড়চড় হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। জিয়া ভারত সফরে এলে যদিও তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়, সেটাই রেওয়াজ, কিন্তু ভারতের নীতির কোনো হেরফের হয়নি। আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও কোনো ভাবান্তর ঘটতে দেখা গেল না জিয়া সম্পর্কে। নিশ্চিত বলা চলে, বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতার ফলে নেহাৎ ভড়ঙে আর ভুলবে না বাংলাদেশের জনগণ।

জিয়া তাঁর ভারত সফরকালে মানবাধিকারের প্রশ্নটি সর্বতোভাবে এড়িয়ে গেলেন। আলোচনান্তে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের যে যুক্তবিবৃতি বেরোয়, তাতে মানবাধিকার প্রসঙ্গটি উহ্য। পরে জানা গেল, ওই প্রসঙ্গটি নিয়ে অনেক রাত

অবধি রাষ্ট্রপতি ভবনে দু'তরফে বিস্তর কথা কাটাকাটি চলে। ভারত চেয়েছিল যে- 'দু'দেশই মানবাধিকারকে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করতে সংকল্পবদ্ধ' এই কথাটি যুক্তবিবৃতিতে স্থান পাবে। কিন্তু জিয়ার জেদে তা হল না। অর্থাৎ যতই উনি গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরুন, ভিতরকার সামরিক পোশাকের বেল্টটা শক্ত করেই আঁটা। কী পরিণামের আশঙ্কায় জানি না, যে-কোনো পরিবেশেই তাঁর স্বৈরাচারী চরিত্র তাঁকে সবকিছু বিস্মরণ করিয়ে দেয়। ইসলামিক রাষ্ট্রগুলির বোধহয় এইটেই নসিব। দুনিয়ার কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে গণতন্ত্র টেকেনি। এর বেশিরভাগ দেশেই প্রশাসকরা ক্ষমতায় এসেছে রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করে, নয়তো তাদের কারান্তরালে রেখে। অল্পদিনের জন্য হলেও বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছে। যদিও তা নেহাৎই অল্পদিন- ত্রিশ বছরের মধ্যে মাত্র চার বছর। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অতীত পঁচিশ বছরেরও অনেককাল কেটেছে তাঁদের জঙ্গীজামানায়। এই জন্যই বাংলাদেশের মানুষ আজ সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে চায় গণতান্ত্রিক জীবনে উত্তরণ।

মুজিব বলেছিলেন-'আমাগো দাবাইয়া রাখতে পারবা না।' জিয়াও বোধহয় সমঝাতে লাগলেন, জনগণকে খুব বেশিদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। তবু জিয়া জিয়াই, মুজিব নন।

তাহলে কে এই জিয়া? কী তাঁর অতীত? কেমন করেই বা পৌঁছে গেলেন ক্ষতার মসনদদে? আসুন একনজর পিছনের ইতিহাসটার দিকে তাকাই।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বয়স যখন আঠারো, তখন তিনি যোগ দেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। ট্রেনিং নেন বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগে এবং উনিশ শ' ঊনষাট থেকে চৌষট্টি পর্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন ওই বিভাগে। পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিতে প্রধানরূপে জিয়া ছিলেন, খেমকরণ রণাঙ্গনে। মুক্তিযুদ্ধের কয়েকমাস আগে তাঁকে বদলি করা হয় চট্টগ্রামে, নবগঠিত অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে। তখন তিনি মেজর। অল্প দিনের মধ্যেই দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, উনিশ শ' একাত্তরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হলেন জিয়া। আর মুক্তি অর্জনের পর যেন তার উল্কার মতো আবির্ভাব। তিয়াত্তরের গোড়ায় বিগ্রেডিয়ার, শেষের দিকে অক্টোবরে একেবারে মেজর জেনারেল।

ওই সময় ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম একটি মজার মন্তব্য করেছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। নজরুল বলেন, 'স্বাধীনতার ফসল জনসাধারণ কতটা পেল জানি না, তবে

ছোটোমাপের কিছু লোক আশাতীত উচ্চপদে আসীন হতে পেরেছে। এমন অনেক লোককে ডিএম করা হয়েছে যাদের এসডিও হওয়ারও যোগ্যতা নেই। আবার যারা ডিএম পদের অযোগ্য তারা সব হয়েছে সেক্রেটারি। তেমনি সামরিক বাহিনীতে যে ছিল সাধারণ সৈনিক সে-ই রাতারাতি দেখি মেজর বনেছে। মেজর হয়ে গেছে মেজর জেনারেল। এই অবস্থায় প্রশাসন টলমল করবে, আশ্চর্য কী। পাকিস্তানি আমলে যে আমলারা সাধারণ মানুষের ওপর চালিয়েছিল শোষণ আর নিপীড়ন, তারাই তো রয়ে গেছে। স্বভাব কি আর সহজে বদলায়। সবকিছু সামলাতে অনেক দিন লাগবে।' সৈয়দ সাহেবের কথাগুলি যে কতো সঠিক, পরবর্তী ঘটনাবলীই তার সাক্ষ্য দেবে।

সদ্য-স্বাধীন দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সামনে যে-সব কঠিন বাধা দেখা দেয়, তা নিয়ে গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের উদ্বেগ সৈয়দ নজরুল ইসলামের কথায় স্পষ্ট ধরা পড়ে। কিন্তু জিয়াকে নিয়ে যে সমস্যা, তার স্বরূপ সম্পূর্ণই আলাদা। প্রশ্নটা হল, শেষপর্যন্ত কি এই ছদ্মবেশী একনায়কতন্ত্রই থাকবে, না, তার যা যথোপযুক্ত ও স্বাভাবিক পরিণতি, তাই তাকে দেখতে হবে? কী আছে বাংলাদেশের ভাগ্যে, গণতন্ত্র, না একনায়কতন্ত্র? নাকি অন্য কিছু অবশ্যম্ভাবী?

দারিদ্র্য এই আট কোটি মানুষের দেশটির এক বড় সমস্যা। তার উপর বৈদেশিক ভিক্ষানির্ভরতা পুরো পঙ্গু করে ফেলেছে এর অর্থনীতিকে। নির্বাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আর এক উদ্বেগজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। জিয়ারই স্বীকৃতি, খাদ্যঘাটতি চলছে বছরে তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি টন। তারই মধ্যে প্রশাসনের সর্বস্তরে যে-ভাবে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তাতে জিয়াকেই কবুল করতে হয়, এ অবস্থায় দেশ-শাসন অসম্ভব।

স্বাধীনতা অর্জনের পর যে শিশুরাষ্ট্র নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করেছিল, আজ সে তার নিকুচি করছে।

আঠাশটা রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে। আর তার পঁচিশটাই সাম্প্রদায়িক। এখনকার আট কোটি মানুষের মধ্যে সাত কোটি কুড়ি লাখই মুসলমান। ধর্মের জিগির তুলে পাকিস্তান, সৌদি আরব আর লিবিয়া এন্তার সাহায্যের আশ্বাস দেয় বাংলাদেশকে। যদিও দরকারের সময় দেখা গেল সব ভোঁ-ভা। পাক-পরিক্রমাকালে ব্যাপারটা মোক্ষম মালুম হল জিয়ার।

এই জিয়াই একদা পাকিস্তানের বর্তমান শাসনকর্তা আর এক জিয়া-জিয়াউল হকের অধীনে সামরিক গোয়েন্দা শাখার ক্যাপ্টেন ছিলেন। দুই রাষ্ট্রই আজ এই দুই জিয়ার জিম্মায়। কেমন যোটক মিল! অথচ ভাগ্যের কী পরিহাস, বাঙালি জিয়া যখন পাঞ্জাবি জিয়ার কাছে নিজেদের পাওনার দাবি

তুলল, জবাব এল, তোমাদের ফৌজের জন্য আমাদের পঞ্চাশ হাজার জোড়া জুতো আর মোজা মজুত আছে, নেবে?

জিয়াকে জিয়ার জুতো। মুখের মতো জবাব।

যাহোক, পৃথিবীতে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যে-সব ডিকটেটর ক্ষমতা কব্জা করেছে তারা কেউ স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেয়নি। পাকিস্তানে আয়ুব বা ইয়াহিয়া সে-পথ নেননি, তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। ডিকটেটররা নির্বাচন করে তাদের স্বৈরতন্ত্রী কাঠামোটা একটু গোছগাছ করে নিতে। জিয়ার কাজও যাচাই হবে কালের কষ্টিপাথরে।

জেনারেল জিয়ার অভ্যুত্থানের অনেক আগেই দেশের নেতারা আঁচ করেছিলেন, মুজিব-সরকারকে ফেলে দেওয়া হবে। উনিশ শ' একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই যে-ষড়যন্ত্র শুরু হয় তার জের এখনও চলছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন অন্তবর্তী সরকারের এক অন্যতম নায়ক জানতেন এই ষড়যন্ত্রের খবর। সকলকে তিনি সতর্কও করেন। কিন্তু কেউ কান দেয়নি সেদিন তাঁর কথায়। উল্টে তাঁকেই বলা হল 'ভারতের চর'। পনেরই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের অনেক আগেই তিনি আমাকে একদিন আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের স্বীকার হতে চলেছি।' তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলল।

২

উনিশ শ’ একাত্তরে স্বাধীন সরকারের প্রধানকেন্দ্র ছিল মুজিবনগর। জায়গাটা কোথায় তা নিয়ে সাধারণের মধ্যে সেদিন দারুণ কৌতুহল ছিল। ভারতীয় সাংবাদিকরা প্রায় সবাই জানতেন। কিন্তু পাছে মুক্তিযুদ্ধের কোনো ক্ষতি হয়, তাই ভেবে এ-বিষয়ে তাঁরা সেদিন কিছু প্রকাশ করেননি।

পঁচিশ মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতমুখী উদ্বাস্তুস্রোত শুরু হয়। কী স্রোত! দেখতে দেখতে বন্যার ঢল। দ্রুতগতি এদের জন্য ত্রাণ-ব্যবস্থা করা কঠিন সমস্যা হল। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করলেন। ত্রিপুরার লে. গভর্নর এ.এল. ডায়াস রাজ্যপাল হয়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে দিল্লির শাস্ত্রী ভবন থেকে পাঠানো হল কলকাতায়। তাঁকে করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত মন্ত্রী।

পঁচিশ মার্চ মুক্তিফৌজের পূর্বপাকিস্তান অভিযানের পর থেকে প্রচণ্ড কর্মচঞ্চল কলকাতা। আওয়ামী-লীগ নেতা নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলি, খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ জাতীয় আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত বহু বিশিষ্ট সদস্য গোপনপথে পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছলেন। তাজউদ্দীন গেলেন নয়াদিল্লীতে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। তারপর এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন কুষ্টিয়া জেলার এক আমবাগানের ছায়ায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের হল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। ভারত এবং বিদেশের বহু সাংবাদিক সেদিন সেখানে উপস্থিত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কলকাতায় তখন দিকে দিকে উদ্দীপনা। গড়ে উঠল সহায়ক সমিতি। অর্থসাহায্য সংগৃহীত হতে লাগল। শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা পথে বেরোলেন মুক্তিফৌজের প্রেরণা জোগাতে। পাত্র উপচে পড়তে লাগল অজস্রের দানে। থিয়েটার রোডে খোলা হল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কার্যালয়। আরো একটা অফিস চালু হয় প্রিনসেপ স্ট্রিটে।

আসল লড়াইটা পরিচালিত হতে লাগল থিয়েটার রোডের হেড কোয়ার্টার থেকে। এখানকার নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ আর মনসুর আলী। প্রিনসেপ স্ট্রিট থেকে কামরুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলি, আবদুল মান্নান আর মিজানুর রহমান চালাতেন জনসংযোগের কাজ এবং প্রচার অভিযান।

স্বাধীন সরকার গঠিত হওয়ার পরদিনই কলকাতার পাকদূতাবাসের তৃতীয় সচিব মোকশেদ আলি সার্কাস এ্যাভিনিউ দূতাবাসের উপর থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ফেলে উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের বৈজয়ন্তী।

এরপরই মোকশেদ আলির টেলিফোন– শিগগির চলে আসুন, দেখুন কী করেছি। ছুটলাম। কিন্তু কার সাধ্য ঢেউ ঠেলে এগোয়। দূতাবাসের সামনে তখন আবেগ-উচ্ছল জনসমুদ্র। বাঁধভাঙা ভিড়কে বাধা দিতে বন্ধ করা হয়েছে দূতাবাসের ফটক। এই 'জনতরঙ্গ রোধিবে কে?' দরজা খুলে দিতে বাধ্য হলেন ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলি।

ইসলামাবাদের সঙ্গে সর্ম্পক ছিন্ন করল কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশন। দুনিয়ার পাক দূতাবাসগুলির সামনে নয়া নজির হল এই ঘটনা। হোসেন আলি এক বিবৃতিতে বললেনঃ দীর্ঘ বাইশ বছর কাজ করেছি পাকিস্তানি কূটনৈতিক বিভাগে। এমনকি, পাকিস্তানি সৈন্যদের উন্মত্ত ধ্বংসলীলা আর তার মুখোমুখি বাংলাদেশের মানুষের প্রাণপণ লড়াইয়ের দিনেও সব সহ্য করে দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু আর নয়। বাংলাদেশ সম্পর্কে পাক-সরকার মিথ্যের পর মিথ্যে রিপোর্ট চালিয়ে যাচ্ছে। সত্যঘটনা চাপা দেওয়া হচ্ছে। আজ ফাঁস হয়ে যাচ্ছে সব। অত্যাচারিত, আতঙ্কিত হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতার যে-বিবরণ পাচ্ছি তাদের কাছ থেকে, তা মর্মন্তুদ। আর যে-ভারতকে চিরশত্রু বলে এসেছে পাকিস্তান এতকাল ধরে, সেই ভারতই আজ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের ওই অসহায় নরনারীর আশ্রয়দাতা, ত্রাতা। একটা জাতিকে নির্মূল, নিশ্চিহ্ন করার সুগভীর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে পাক সরকার।

হোসেন আলি আরো বললেন : এই যে অস্থায়ী সরকার– এর পরিচালক বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ। তাই এঁদের সাথেই তাঁরা আজ হাত মিলাচ্ছেন। এঁদের নির্দেশেই মাথা পেতে নেবেন। নিষ্কলঙ্ক বিবেক নিয়ে অত্যাচারী ইসলামাবাদ সরকারের দাসত্ব আর সম্ভব নয়। এখানকার কূটনৈতিক মিশনের প্রধানরূপে আমি আজ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক

বাংলাদেশের প্রতি অনুগত ঘোষণা করছি। আমার অফিস এখন থেকে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন হিসেবে কাজ করবে।

এরপর তাঁর আরও দৃপ্ত ঘোষণা : আজ আমি বিদ্রোহী। ওপারে আমার ভাই-বোনদের যখন নির্বিচারে খুন করা হচ্ছে, তখন সীমান্তের এপারে আমি আর কিছুতেই শান্ত অফিসারটি সেজে বসে থাকতে পারছি না। আমি বাংলাদেশের পক্ষে লড়াই করতে চাই।

এই অবস্থায় চব্বিশ এপ্রিল পাক-সরকার কলকাতায় তাদের ডেপুটি হাই কমিশন অফিসটি বন্ধ করা হল বলে ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে ভারত সরকার তার বিদেশ-মন্ত্রকের (পাকিস্তান সংক্রান্ত) যুগ্ম সচিব অশোককুমার রায়কে পাঠালেন কলকাতায়। তিনি এসে অফিস খুললেন বালিগঞ্জ পার্ক রোডে। এই অফিসের কাজ হল নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারকে সবরকমভাবে সাহায্য করা। বস্তুত পরবর্তী নয় মাস এই অশোক রায়ই ছিলেন ভারত এবং বাংলাদেশ সরকারের মাঝখানকার যোগসূত্রের মাধ্যম। তাঁর এই অফিস একদিকে এক কোটির অধিক শরণাগতের ত্রাণকার্য চালিয়েছে, অপরদিকে এগিয়ে দিয়েছে যুদ্ধের কাজ।

এদিকে বাংলাদেশ সরকার গোটা বিশ্বের কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে, চাইছে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, দাবি করছে স্বীকৃতির। এমন সময় মৌলানা আবদুর হামিদ খান ভাসানী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে হাজির। এই জটিল-চরিত্র বিতর্কিত বৃদ্ধ মৌলানা ঘর থেকে নানা পথ ঘুরে পৌছান প্রথমে আসামের গোয়ালপাড়ায়, সেখান থেকে সোজা কলকাতা। এসে দেখা করলেন তাজউদ্দীনের সঙ্গে। তাজ মৌলানাকে বললেন, এখন কী বলবেন আপনি? সবই দেখলেন। এবার প্রকাশ্য বিবৃতি দিন। ভাসানীর মৌলানা ভেসে উঠলেন। বিবৃতি দিলেন : 'এই মুক্তিযুদ্ধে গোড়ায় কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ছিল না। বা যে পরিণামের দিকেই এ চলুক, পশ্চিম পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের গণসংগ্রামরূপে এর সূচনা।'

এরপর ভাসানী সাহেব দেখা করেন ভারতের শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর সঙ্গে। তারপর উদাত্ত আহ্বান সভ্য দুনিয়ার কাছে : বাংলাদেশের জনগণের এই চরম দুর্দিনে কেবল দর্শক হয়ে থাকবেন না।

মইনুল হক চৌধুরীকে তিনি লেখেন : ডিকটেটর ইয়াহিয়া খানের পাকবাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র, নির্দোষ চাষি-মজুর-তাঁতি, ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপক এবং বিভিন্ন বৃত্তির হাজার হাজার মানুষের উপর নির্দয়ভাবে ট্যাঙ্ক, কামান এবং অন্যান্য মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা নির্বিচারে ধ্বংস

করছে ঘর-বাড়ি, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ সব কিছু। এ লড়াই আক্রমণকারী পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে পবিত্র জেহাদ।

দু'খানি পত্র পাঠালেন ভাসানী চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ এবং প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই এর কাছে। এতে তিনি ইয়াহিয়ার স্বেচ্ছাচারী বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের সাহায্য চান।

এরপর কলকাতায় অস্থায়ী ডেরায় যথাসাধ্য গোপনে অবস্থান করতে লাগলেন ভাসানী।

এদিকে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিফৌজ। বর্ষা এল। লড়াই তখন তুঙ্গে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মন্ত্রী, সংসদীয় প্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সবাই আসতে লাগলেন বাংলাদেশ সীমান্ত এই কলকাতায়। ভিআইপি-দের উদ্বাস্তু শিবিরগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করল ভারত সরকার। হৃদয়স্পর্শী সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন তাঁরা। পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রকাশ হতে লাগল সমস্তকিছু।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দিতে লাগল। সেপ্টেম্বরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা এলেন। বাংলাদেশের নেতৃবর্গের সঙ্গে পর পর কয়েকটি বৈঠক হল তাঁর। এর পরই তিনি বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ইউরোপ-আমেরিকা সফরে গেলেন। নিক্সন সরকারকে তিনি তীব্রভাষায় আক্রমণ করলেন রাষ্ট্রসংঘে (জাতিসংঘে)।

এটা অক্টোবরের ঘটনা। গোটা পশ্চিমবঙ্গ তখন টগবগ করছে উত্তেজনায়। নভেম্বরের শুরু থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের সীমান্ত অতিক্রম এবং হামলার মাত্রা বেড়ে যায়।

বাইশ নভেম্বর একটা দারুণ ঘটনা ঘটল। কলকাতার ষাট মাইল দূরে, ভারতের সীমান্তবর্তী চব্বিশ পরগণার বয়রা গ্রামের উপরে পাঁচহাজার ফুট উঁচু আকাশে পাকিস্তানি স্যাবার জেট আর ভারতের ন্যাট বিমানের এক লড়াই হয়ে যায়। এতে ভারতের দক্ষ বৈমানিকদের হাতে ঘায়েল হল ওরা। তিন তিনটে স্যাবার সাবার। ভূপাতিত বিমান তিনটির ত্রিমূর্তি পাইলট ধৃত।

পঁচিশ নভেম্বর সীমান্তে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাছে নির্দেশ গেল আর চুপ করে থাকা নয়, আত্মরক্ষার জন্য দরকার হলে সীমান্ত ডিঙিয়ে যাবে। গোড়াতেই ঘায়েল করো ওদের আক্রমণের উদ্যোগ। লোকসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন : পাকিস্তানি সামরিক হঠকারিতা আর বরদাস্ত করা হবে না। ভারতের জওয়ানরা উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য তৈয়ার। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিতে আর নিজেদের দোষ

ভারতের কাঁধে চাপাতে পাকিস্তান যে-কোনো সুযোগে ভারতকে আক্রমণ করতে পারে।

তিনি আরও বললেন: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঈদ মোবারকটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে এমন একটা ভাব ফোটানোর চেষ্টা হয়েছে যেন ওঁরা সামরিক শক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসী নন, রাজনৈতিকভাবেই সমস্যার সমাধানে আগ্রহী, ভারতকে বিভ্রান্ত করার এ এক নয়া চাল মনে হয়।

প্রধানমন্ত্রী লোকসভাকে জানালেন : মুক্তিফৌজকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে বাংলাদেশের জনগণ। ইতিমধ্যে তাদের হাতে বহু পাকসৈন্য নিধন হয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্ত হয়েছে পাকবাহিনীর দখল থেকে।

তিনি আরও বলেন : উনিশ শ' সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ-এর জানুয়ারির ঘটনা এবং পঁয়ষট্টির আগস্ট-এর অভিজ্ঞতা ভারত ভোলেনি। তাই আজ সীমান্তে সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য যখনই দরকার হবে, তারা সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রুকে শায়েস্তা করবে।

একুশ নভেম্বর। পাকবাহিনী ট্যাঙ্ক আর ভারী বন্দুক নিয়ে মুক্তিফৌজের উপর আক্রমণ চালায়। ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরে তাদের গোলাগুলি এসে পড়তে থাকে। কয়েকজন ভারতীয় এতে প্রাণ হারায়। এই পরিস্থিতির পাল্টা জবাব দিতে হল ভারতীয় বাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডারকে। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হল তেরটি পাকিস্তানি সিফি ট্যাঙ্ক।

৩

সে এক মহানিশার কাল। বাংলাদেশ জুড়ে চলেছে দখলদার পাক-চমূর উন্মত্ত তাণ্ডব। অপরদিকে পাকিস্তানি কারাগারের অন্ধকার সেলে ফাঁসির দিন গুণছেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হচ্ছে বহ্নুৎসবে। চলছে নরমেধ যজ্ঞ। গলিত শবগন্ধে বাতাস বিষাক্ত। অত্যাচারিত, অসহায়, নিষ্পাপ নরনারীর আর্তরবে আল্লার আসনও বুঝি কেঁপে ওঠে। গোটা দুনিয়া দেখছে ইতিহাসের এক জঘন্য অধ্যায়।

নির্ভীক বাঙালি তরুণদল জীবন সঁপে দিল মুক্তিযুদ্ধে। তাদের স্লোগান বদলা চাই। হিংসার জবাবে হিংসা, খুনের বদলা খুন। ওরা করছে নরহত্যা, আমরা করব জানোয়ার জবাই। বিশ্ববিবেকের কাছে তাঁদের আহ্বান, আমাদের পাশে দাঁড়ান।

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হল। মুজিবনগর থেকে বেতারে সম্প্রচারিত হতে থাকল সংগ্রামের আহ্বান, মুক্তিযুদ্ধের বার্তা। জন-মনে জেগে উঠল মরণপণ উদ্দীপনা।

এমন সময় হঠাৎ একটা খবর পেয়ে চমকে উঠলাম। ঢাকার একজন 'বিশেষ' সাংবাদিক পাকিস্তান রওনা দিয়েছে। আমার সাংবাদিকী কৌতূহল চাড়া দিয়ে উঠল। সরাসরি যোগাযোগ করলাম বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে। ইতিমধ্যে যা খোঁজ পেলাম, তা হল এক গভীর ষড়যন্ত্র। কেমন যেন একটা গন্ধ পেলাম– অস্থায়ী সরকারেরই কিছু লোক সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ভাবলাম, এ ব্যাপারটা বার করতেই হবে। এক চাঞ্চল্যকর খবর ফাঁস করতে পারব আমাদের পত্রিকায়। সন্দেহের বনেদটাকে আগে চাই পাকা প্রমাণে দাঁড় করানো। কিন্তু মুজিবনগর সেক্রেটারিয়েট থেকে বিদেশ দফতর আর জয়বাংলা অফিস থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র পর্যন্ত বৃথাই ছোটাছুটি করলাম। কোথাও কিছু পেলাম না।

শেষপর্যন্ত হাজির হলাম অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের কাছে। তাঁর তখন নিঃশ্বাস ফেলবারও ফুসরৎ নেই। তবু আমাকে সময় দিলেন। বললেন– লানচের সময় আসুন। অফিসে জায়গা খুব কম। তার মধ্যেই লাগোয়া একটি কামরায় তিনি থাকেন। আমি গিয়ে দেখি সেখানে বসে আছেন। মেস থেকে খাবার আসবে। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি– আপনি এখানেই খাওয়া-দাওয়া করেন নাকি?

– হ্যাঁ, একটা শপথ পালন করছি।

– শপথ? কিসের শপথ পালন হচ্ছে এখানে খেয়ে?

তাজউদ্দীন বললেন– তা হলে শুনুন, আমাদের যে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়, সেখানে সৈয়দ সাহেব আর আমরা চার মন্ত্রী কসম করি, যতদিন বাংলাদেশ স্বাধীন না হয়, ততোদিন কেউই আমরা পরিবারের সঙ্গে সংশ্রব রাখব না। অন্যরা কী করছেন বলতে পারব না। তবে আমি কসম খেলাপ করতে জানি না। তাই এইখানেই কাজ করি, এইখানেই খাই, ঘুমোই।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা ভালোই হয়েছে, কী বলুন? বেশি সময় কাজ করতে পারছি এতে, তাই না?

আমি অবাক বিস্ময়ে তাজের কথা শুনছিলাম, বোঝার চেষ্টা করছিলাম। মনে হল পলিমাটির দেশের এই মানুষগুলি যেন ইস্পাত হয়ে উঠছে।

মেস থেকে খানা এল। কথা চলল খেতে খেতে। মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবের বিচার, ঢাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি ইত্যাদি আরও অনেক কথা। এর ফাঁকেই টুক করে আমি আসল কথাটা গলিয়ে দিলাম– আচ্ছা ঢাকা থেকে যে সাংবাদিকটি এলেন, তিনি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, আপনি গররাজি হলেন কেন?

ঢাকার ওই সাংবাদিকের নাম করতেই জ্বলে উঠলেন তাজউদ্দীন। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, আপনি না একজন ঝানু সাংবাদিক? আপনিও বুঝতে পারছেন না? ওর কাছে কী আছে জানেন? পাকিস্তানি পাসপোর্ট। দেখছেন না, কতো সহজে লোকটি আমাদের বিদেশ দফতরে ঠাঁই করে নিল!

তাজউদ্দীন সাহেব বিদেশ দফতরের কথাটা বলতেই এক রহস্যকুঠরির যেন দরজা খুলে গেল আমার সামনে। সন্দেহের গন্ধটা আমারও ওইদিক থেকেই আসছিল। আর রাখঢাক না করে আমি ষড়যন্ত্রের কথাটা সরাসরি জানতে চাইলাম তাঁর কাছে। মনে হল, কী যেন খুঁজতে উনি গভীর মগ্ন হলেন। কী ভাবছেন? তাজউদ্দীন সাহেব নানা ঘটনাসূত্রে আমাকে বিশ্বাস করতেন। না, গোপন করলেন না কিছু। বললেন– বসুন তা হলে, হাত-মুখ

ধুয়ে আসি, মুখে কিছু বলব না আমি। ফাইলটা দেখাচ্ছি। আপনি সব বুঝতে পারবেন।

'টপ সিক্রেট' লেখা একান্ত গোপনীয় একটা লাল ফাইল তাক থেকে পেড়ে দিলেন আমার সামনে। কিছুটা অংশ একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন নিজে। তারপর বললেন– পড়ে দেখুন, চান তো নোটও নিতে পারেন এই ফাইল থেকে। তবে ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে। এক্ষুণি কিছু প্রকাশ করবেন না।

কথা দিলাম। সতর্ক দৃষ্টিতে ফাইলটা দেখছি। সুড়ঙ্গের সন্ধান পেলাম। নেমে যাই রহস্যের গভীরে। সেখানে ঝিকমিক করছে দেখি তথ্যের মণিমুক্তোগুলি।

জনৈক মাহবুব আলম চাষীর একটি প্রস্তাবের অনুলিপি পেলাম ফাইলের মধ্যে। তাতে জনাব মাহবুব আলম পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব করেছেন।

ওই প্রস্তাবের পরেই আছে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের এক স্বাক্ষরিত নোট। নোটের বয়ান– 'যারা এ ধরনের ষড়যন্ত্রে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে পার্টির (আওয়ামী লীগের) রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে মাহবুব আলম চাষী যখন একজন সরকারি পদস্থ অফিসার, তাকে আমি এক্ষুণি তাড়িয়ে দিচ্ছি। সে একজন জঘন্য ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত।'

এটা উনিশ শ' একাত্তরের ঘটনা। মুক্তিফৌজ এবং বাঘা সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে হানাদার পাকবাহিনী। সূর্যাস্তের পর আর পাক-চমূর একটিও ক্যান্টনমেন্টের নিরাপদ এলাকার বাইরে গোঁফ দেখাতো না। প্রতিদিন পাকসৈন্য আর রাজাকার মুক্তিফৌজের হাতে খতম হচ্ছে, এন্তেকাল ফরমাচ্ছে। বরিশাল খুলনা রণাঙ্গনে মেজর জলিল, আখাউড়া রণাঙ্গনে মেজর খালেদ মোশাররফ, যশোরে মেজর ওসমান আর মেজর হুদা এবং টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে বাঘা সিদ্দিকী একের পর এক অঞ্চল মুক্ত করছে পাকবাহিনীকে হটিয়ে। রাজশাহীর ভোলারহাট, দিনাজপুরের তেঁতুলিয়া, রুহিয়া, পচাগড়, চোরঘাট, রংপুরের পাটমারি, বইমারি, চিলমারি প্রভৃতি এলাকা চলে এসেছে মুজিবনগরের শাসনাধীনে। সারাদেশ তখন রণাঙ্গনে পরিণত। ব্যাপক গেরিলাযুদ্ধ চলছে খুলনা, চট্টগ্রামে।

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাজউদ্দীন বিদেশ সচিব মাহবুব আলম চাষীকে বরখাস্ত করলেন। বিদেশমন্ত্রী খোন্দকার তাঁর আশ্রিত ওই লোকটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন যথেষ্ট। কিন্তু তাজউদ্দীনের সিদ্ধান্ত অনড়। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেনকে বিদেশসচিবের পদে নিয়োগ করা হল।

এবার ধীরে ধীরে ধরা পড়তে লাগল চক্রান্তটা। মুক্তিযুদ্ধ যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময়ই একটি বিদেশি সংস্থার যোগসাজসে এই ষড়যন্ত্রের সূচনা। খোন্দকার এবং মাহবুব চাষী ছাড়াও এই চক্রান্তে ছিলেন কর্নেল ওসমানী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তাহেরউদ্দীন ঠাকুর, ফরিদপুরের ওবায়দুর রহমান আর শাহ মোয়াজ্জেম, মুন্সিগঞ্জের ডা. টি, হোসেন, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটি খবরের কাগজের সম্পাদক মহম্মদ খালেদ প্রমুখ চাঁই। শত্রুর কবল থেকে দেশ উদ্ধারের জন্য একদিকে যখন বুকের রক্ত ঢেলে লড়াই করছে মুক্তিফৌজ, অপরদিকে তখন ওই বেঈমানের দল কলকাতায় হোসেন আলির ডেরায় ঘনঘন গোপন বৈঠকে মিলিত হচ্ছে, শলা-পরামর্শ করছে মুক্তিফৌজের পিছনে চাকু মারতে, খতম করতে মুক্তিযুদ্ধ।

একটি গোপন পাল্টা-সরকার দাঁড় করালো খোন্দকার চক্র। গরহাজির হতে থাকলেন খোন্দকার মন্ত্রিসভার বৈঠকে। কেমন যেন অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন তাজউদ্দীন। তিনি ওকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে রাষ্ট্রসংঘে (জাতিসংঘ) যেতে দিলেন না। ফলে বিরোধটা স্পষ্ট হল। প্রকাশ্যে এল। তবে ষড়যন্ত্রটা অল্পদিনেই ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আর লম্ফঝম্প করতে পারল না এ নিয়ে ওরা। চক্রের মিয়ারা মিইয়ে গেল।

ক'মাস আগেই স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্রের কর্মীরা সপারিষদ তাহেরউদ্দীন ঠাকুরকে তাড়িয়ে দেন সেখান থেকে। আখাউড়া সেক্টরে এক কিলোওয়াটের একটি বেতারযন্ত্র পরিচালনের ভার ছিল তাহেরউদ্দীনের উপর। একবার ধরা পড়ল– সরকারি নির্দেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি নির্দেশ দেন তিনি মুক্তিফৌজকে। এতে বিভ্রান্ত হন কর্তব্যরত জওয়ানরা। ব্যাপারটা ধরা পড়ায় খালেদ মোশাররফের রোষ থেকে রক্ষা পেতে সেঙাতদের নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেন তিনি। এসে আশ্রয় নেন মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্রে। সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে নতুন করে ঘোঁট পাকাতে লাগলেন।

রাতের অন্ধকারে চক্রান্তকারীরা মিলিত হতো। ওরা একটা মতলব আঁটে। বিদেশ দফতর একটা পশ্চিমীচক্রের মাধ্যমে ইয়াহিয়ার সামরিক জুন্টার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জুন্টাকে বোঝাবে– 'একটা ঢিলেঢালা পাক-কনফেডারেশনের মধ্যেই তারা যদি বাংলাদেশকে 'পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য' দেয় তাহলে এখনো পাকিস্তানকে অটুট রাখা সম্ভব। এতে রাজি হলে এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করা যায়।' বিদেশ দফতরের সচিব মাহবুব আলম চাষী এই প্রস্তাবটাই পাক-জুন্টার কাছে পাঠায়। ওই বয়ানের সঙ্গে সে আরও জানিয়ে দেয়, জেনারেল ইয়াহিয়া এই প্রস্তাবে রাজি হলে জনাব

খোন্দকার এক প্রতিনিধিদল নিয়ে যাবেন। কর্নেল ওসমানীও থাকবে তাঁর সঙ্গে।

কর্নেল ওসমানীকে সঙ্গে রাখার পিছনে খোন্দকার সাহেবের মতলবটা ছিল তাহলে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে একটা ফাটল ধরানো যবে। ধোঁকা দেওয়া যাবে দেশের লোককেও। জনসাধারণকে বোঝানো যাবে, শেখ মুজিবকে মুক্ত করার জন্যই এসব করা হচ্ছে। আর তাজউদ্দীন যে এসব চাইছে না তার কারণ, মুজিব ফিরে এলেই তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে, এই তার ভয়। ব্যস, এক ঢিলে দুই পাখি মারার তাক করলেন খোন্দকার।

আরও একটা চাল খেলল খোন্দকার-চক্র। প্রচুর হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে ছড়িয়ে দিল মুক্তিফৌজের শিবিরগুলিতে। সেগুলির হেডিং– 'বঙ্গবন্ধুর মুক্তি?' ভিতরের বয়ান : স্বাধীনতার লড়াই চালানোর জন্য যে-কোনো শর্তে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে আনতে হবে। তাঁর জীবনরক্ষার জন্য দরকার হলে কিছুদিনের জন্য মুলতবি রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধ।

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বীরদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিল এতে। কেউ কেউ যেন ভেঙে পড়ল। সেই সংকটমুহূর্তে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে স্বাধীন রেডিও। শিবিরে শিবিরে, সীমান্তে, সমরক্ষেত্রে ধ্বনিত হতে লাগল ক্লান্তিহীন সংগ্রামের বাণী। দিনের পর দিন তাদের উদাত্ত কণ্ঠ এনেছে তরুণদের মধ্যে শত্রুসৈন্য নিশ্চিহ্ন করার উন্মাদনা। বারবার রেডিও থেকে সম্প্রচারিত হতে থাকল এক কথা– মাতৃভূমির মুক্তির আগে এ-লড়াই থামবে না, এগিয়ে চলো ভাই সব। মুক্তিযুদ্ধের সেই উদ্দাম বন্যার তোড়ে ভেসে গেল খোন্দকার এন্ড কোং, আরবার কেঁচে গেল কুচক্রীদের মতলব।

ওই সময় আমি রোজ রাতের বেলায় তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম আর কামরুজ্জামানের সঙ্গে দেখা করতাম। আলোচনা হতো রোজকার খবর নিয়ে।

কীভাবে এই ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে ওঠে, এর স্বরূপই বা কী, তা বুঝতে হলে আমাদের সেই গোড়ায় যেতে হবে যখন আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। উনিশ শ আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশে পূর্ব পাকিস্তানে লীগ যখন গঠিত হয়, তার প্রেসিডেন্ট হন মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সেক্রেটারি হন টাঙ্গাইলের যুবনেতা শামসুল হক। শেখ মুজিবুর রহমান আর খোন্দকার হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক। শামসুল হক অসুস্থ হয়ে পড়লে মুজিবকেই কার্যকরী সম্পাদক করলেন ভাসানী। তিনি মুগ্ধ ছিলেন মুজিবের সংগঠন ক্ষমতায়। এর মধ্যেই মুজিবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে– বিশেষ করে ঢাকা ও রাজশাহীর ছাত্র আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধস্তন কর্মী ধর্মঘটে আর

আটচল্লিশের প্রথম ভাষা আন্দোলন। এই খ্যাতিই মুজিবের প্রতি খোন্দকারের ঈর্ষাজাত বিদ্বেষের উৎস। তবে দলের অভ্যন্তরে মুজিবের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের ফলে প্রকাশ্যে কিছু বলতে বা করতে ভরসা করছিলেন না খোন্দকার। তিনি বরং ধীরে ধীরে দলের পরবর্তী আন্দোলনগুলি থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন নিজেকে।

উনিশ শ' চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচনের পর খোন্দকার কৃষক-শ্রমিক পার্টির টোপ গিললেন। ডিগবাজি খেলেন দল থেকে। কৃষক-শ্রমিক পার্টির পরিষদীয় মুখ্যসচেতক হিসাবে আতাউর রহমানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার পতনের কলকাঠি নেড়েছিলেন এই খোন্দকার। চৌষট্টি সালে আবার তিনি লীগে ফিরে আসতে চান। তাকে আবার দলে নিলেন মুজিব। আয়ুব খাঁ ক্ষমতাসীন হন উনিশ শ' আটান্নতে। বাষট্টি সালে তাঁর জঙ্গী একনায়কতন্ত্রের সাঁড়াশি সারা দেশকে চেপে ধরল। ভাসানী সদলে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গড়লেন নতুন দল- 'ন্যাপ'– ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। দলে তখন সভাপতি হলেন মুজিব, তাজ সম্পাদক, সৈয়দ নজরুল সহ-সভাপতি। এ সময় আরও তিনজনকে নেতৃত্বে আসতে দেখা যায়– মনসুর আলি, কামরুজ্জামান এবং অধ্যাপক ইউসুফ।

মুজিব কিন্তু এই অবস্থায়ও অ্যাডভোকেট সালাম খাঁ, খোন্দকার আর জহিরুদ্দীনের মতো ভোলট খাওয়া দলছুটদের কোল দিলেন দলে। মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আজিজুর রহমানের পর্যন্ত ঠাঁই মিলল এখানে। কিছুদিন পরে মুজিব বুঝতে পারলেন, প্রেমে পড়ে ওরা আসেনি। এসেছে এক বিশেষ চক্রের নির্দেশে, বিশেষ এক অভিসন্ধিতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকফৌজের লেজুড়বৃত্তি করে জহিরুদ্দীন তার বকশিশটি পেয়ে গেল। সে এখন রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।

মুজিবের চাইতে খোন্দকার বয়সে বড়। আওয়ামী লীগ যখন গঠিত হয় তখন থেকে দলে তাঁর স্থান মুজিবের সমান। তার ওপর তিনি কিনা একজন অ্যাডভোকেট। অতএব নিজেকে তিনি সবসময় ঠাওরাতেন মুজিবের চাইতে বড়ো নেতা বলে। অথচ এমন ফ্যাসাদ, মুজিবের বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রবল সংগঠন শক্তির সামনে দাঁড়াতেই দিশে পাচ্ছিলেন না। কেবল বিদ্বেষ আর ঈর্ষার আঁখায় আঁচ দেওয়া ছাড়া কিছু করবার ছিল না তাঁর।

মুজিব তাঁকে দলে জায়গা দিলেও তাঁর এই বয়ঃজ্যেষ্ঠ কমরেডকে কোনো ক্রমেই নজরুল, তাজউদ্দীন বা মনসুর আলীর ওপরে স্থান দেওয়ার উপায় ছিল না। দলে তাঁর নম্বর পাঁচ। সহ-সভাপতির কুরশিখানা পেয়েই খুশি থাকতে হল জনাব খোন্দকারকে। কিন্তু খুশি কি এতে হওয়া যায়?

ক'দিন রইলেন ব্যাজার মুখে। তার পরে গেলেন ক্ষেপে। শুরু হল ষড়যন্ত্রের জাল বোনা।

কাদের নিয়ে জোট পাকানো যায়, একটা ফাই-ফর্দ করে নিলেন খোন্দকার। যোগাযোগ পাকা করে গোপনে মিলিত হতে লাগলেন একটা আস্তানায়। আস্তানাটি ছিল ঢাকার অভিযান প্রেসের উপরের একটি ঘরে। সেখানে একে একে অনেক নাক দেখা গেল। মুন্সিগঞ্জের শাহ মোয়াজ্জেম, ফরিদপুরের কে এম ওবায়েদ, কুষ্টিয়ার আজিজুর রহমান, ঢাকার জহিরউদ্দীন, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ। ব্রাক্ষণবাড়িয়ার তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের সঙ্গে আগে থেকেই লাইন হয়ে গেছে খোন্দকারের। ঠাকুর-মিয়ার ভূমিকা তখন-ইত্তেফাক-এর রিপোর্টার।

আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সময় শয়তানের খেল শুরু করে খোন্দকার গোষ্ঠী। আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে, গণ-অভ্যুত্থানের জ্বালামুখীতে, আতঙ্কিত আয়ুব হঠাৎ রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দিলেন। মুজিব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র-মামলায় কারারুদ্ধ। আয়ুব বললেন, এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য মুজিবকে তিনি প্যারোলে ছাড়বেন। কিন্তু এ-সময় আয়ুবের সঙ্গে কোনো রকম বৈঠকে বসার প্রশ্নে মতান্তর দেখা দিল আওয়ামী লীগে। অনেকেই এর বিরোধী। খোন্দকারগোষ্ঠী ব্যস্ত হয়ে পড়ল বৈঠকের জন্য। ইত্তেফাক সম্পাদক মরহুম মানিক মিয়া প্রচারে নামল খোন্দকারের তরফে। উল্টো দিক থেকে রুখে দাঁড়ালেন তাজউদ্দীন। তিনি বুঝেছিলেন, গণ-অভ্যুত্থানে আয়ুব শাহী এখন টলটলায়মান। তিনি চাপ দিলেন সুযোগ বুঝে– নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হলে আগে তথাকথিত আগরতলা-ষড়যন্ত্র-মামলার নিঃশর্ত প্রত্যাহার চাই। প্যারোল-ট্যারোল চলবে না। তা না হলে এই আন্দোলন কেবল চলবেই না, আরও উদ্দাম হয়ে উঠবে।

তৎপর হয়ে উঠল খোন্দকারগোষ্ঠীও। প্যারোলেই রাজি হওয়ার জন্য তারা মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। বেগম মুজিব তখন কুর্মিটোলার জেলে তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন– প্যারোলের অপমান মাথায় করে বেরোলে আমি আত্মহত্যা করব। মুজিব জেল থেকে জানিয়ে দিলেন– প্যারোল নয়, পূর্ণ মুক্ত মানুষ হিসেবে ছাড়া তিনি বৈঠকে বসতে রাজি নন। আগে আগরতলা মামলা তুলে নিতে হবে।

মুজিবের এই সিদ্ধান্ত যে কত দূরদর্শিতার পরিচায়ক, পরবর্তী ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়েছে।

খোন্দকার মোস্তাকের চেহারাটা অস্পষ্টই ছিল অ্যাদ্দিন। উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচন আসতেই স্পষ্টতর হল সেই মূর্তি। তলায় তলায় বেশ খেলিয়ে নিজ ক্যাম্পের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়নপত্র বার করে নিলেন। আবার আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ এর কোনোটার সদস্য না হয়েও তাহেরউদ্দীন ঠাকুর নিজেকে 'সাংবাদিক' বলে জাহির করে পার্টি টিকেট ম্যানেজ করলেন। এই ভাবেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গগনে এক দুষ্ট গ্রহচক্রের আবির্ভাব ঘটে। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওসমানী শুধু যে মনোনয়ন ম্যানেজ করলেন তাই-ই নয়, রাতারাতি নেতাই বনে গেলেন সিলেটের। বলিহারি খোন্দকারি খেল। কলকাঠি নেড়ে নেড়ে সিলেটে তিনি ওসমানীকে খাড়া করলেন সেখানকার জনপ্রিয় নেতা আবদুস সামাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। এভাবে দলের মধ্যে প্রতি জেলাতেই দক্ষিণগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটল।

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। জনগণের রায় অগ্রাহ্য করে দেশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী। আক্রান্ত হতে লাগল নিরপরাধ অসহায় শিশু-বৃদ্ধ-নরনারী। সংগঠিত পাকসৈন্যের অভিযান আত্মপ্রকাশ করল নির্বিচার গণহত্যায়।

গোটা জাতি রুখে দাঁড়াল। বাংলাদেশ নিজেকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচিত হলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি। কার্যকরী রাষ্ট্রপতি হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাজউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীত্বে গঠিত হল চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ। মনসুর পেলেন অর্থ দফতর, কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র আর খোন্দকারের হাতে এল বিদেশ দফতর। এই বিদেশ দফতরটিই তাঁর মোনাসিব ছিল। তবু তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল! এই একটু খেদ রয়ে যায়। অবশ্য খেদ ছাড়া তখনকার মত আর কিছু করবার ছিল না জনাব খোন্দকারের। আবার 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'। খোন্দকারের বিদেশ মন্ত্রকের উপর খবরদারি করছেন তাজউদ্দীন।

এ-সময় এক আলোড়নকারী ঘটনা ঘটে। কলকাতায় পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলি দূতাবাসের সকল কর্মী নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। আনুগত্য ঘোষণা করলেন মুজিবনগর সরকারের প্রতি।

কর্মচারীরা যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই এ-কাজ করে তা পরিষ্কার। তবে হোসেন আলির ব্যাপারটা রহস্যাবৃত।

যখন নয়াদিল্লির পাক হাইকমিশন থেকে দু'জন কর্মচারী-সহ আমজাদুল হক বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে

বেরিয়ে এলেন, তখনই তাজউদ্দীন কলকাতায় বাঙালি ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলি (পরবর্তী সময়ে পশ্চিম জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত)-কে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়ে পত্র দেন। কিন্তু হোসেন আলি সোজা ফেলে দিলেন সেই পত্র। কিছুদিনের মধ্যে রাওয়ালপিন্ডিতে বদলির নির্দেশ এলো হোসেন আলির। হোসেন আলি প্রমাদ গুনলেন। বুঝলেন, লক্ষণ ভালো নয়। তখনই সব গুছিয়ে নিয়ে তাজউদ্দীনের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎকার চেয়ে লোক পাঠালেন। ডেপুটি হাইকমিশনার অন্যান্য অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে ওই রাত্রেই গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। তাজউদ্দীনের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, ওঁরা যদি বেরিয়ে এসে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন তাহলে হোসেন আলি এবং তাঁর সঙ্গীরা এখন যে বেতন, ভাতা ও সুবিধাসকল পাচ্ছেন তার সব দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে মুজিবনগর সরকার।

ব্যস, বদলির আদেশটা অভিশাপের বদলে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াল হোসেন আলির কাছে। তিনি মুজিবনগরের প্রতি সদলে আনুগত্য সই করলেন।

সেই রাতেই ডেপুটি হাইকমিশনের তিয়াত্তরজন বাঙালি কর্মচারীর মধ্যে বাহাত্তরজনই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আর তার সরকারের প্রতি একসঙ্গে আনুগত্য ঘোষণা করে দূতাবাসের দখল নিলেন। যিনি ব্যতিক্রম, সেই তিয়াত্তরতম ব্যক্তিটি হলেন দূতাবাসের প্রথম সচিব আই আর চৌধুরী (মেজর ডালিমের শ্বশুর)। শেষমেষ তাকেও অবশ্য 'তওবা' বলে চলে আসতে হয়।

রবিবারের সকাল। কলকাতার দূতাবাস শীর্ষে উড্ডীন হল স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। হোসেন আলির সংবর্ধনা জুটতে লাগল দেশপ্রেমিক বীররূপে। উচ্ছ্বাসে অভিনন্দনে টাল-মাতাল অবস্থা তাঁর। জাঁকালো সব প্রেস কনফারেন্স করতে লাগলেন তিনি। তিনি হয়ে উঠলেন আন্তর্জাতিক খবরের আলোয় উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব। স্বাধীনতার পর তাঁকেই সচিব করে নিলেন মুজিব। শুধু রহস্যাবৃত রয়ে গেল। তাঁর বদলির হুকুম আর তাজউদ্দীনের আহ্বান প্রত্যাখানের কাহিনি।

একটা ব্যাপারে সেদিন কিন্তু অনেকেই মর্মাহত হয়েছিলেন। বাইরের পাক দূতাবাসগুলিতে যে-সব বাঙালি ছিলেন, তাঁদের বৈদেশিক মুদ্রায় বেতনাদি এবং অন্যান্য সুবিধাগুলির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের যে আহ্বান জানানো হয়, অল্প কয়েকজন ছাড়া সেদিন আর কেউ সাড়া দেননি। পরে অবশ্য স্বাধীনতার একবছর উত্তীর্ণ হলে তাদের অনেককেই পাকগোঠ ছেড়ে আসতে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার প্রাক্তন

প্রভুর পরামর্শেই তা করেন। আর তাঁরাই পরবর্তী সময়ে জিয়ার আমলে সবরকম সুবিধা, পদোন্নতি প্রভৃতি ভোগ করে চলেন।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভালোভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং কাজ-কর্ম ভালোভাবে যাতে চলে, তার জন্য বিদেশ মন্ত্রকে একটি অফিস খোলা হল কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে। এই সময় এসে উদয় হল চট্টগ্রামের এক সমবায়ের প্রাক্তন মালিক সেই মাহবুব আলম চাষী। লোকটি একদা ছিল পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে। অল্পেতেই সে জুলফিকার আলি ভুট্টোর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। কিছুদিন পর তাকে দেখা গেল, রাঙামাটিতে এক বিদেশি সংস্থার সহযোগিতায় একটি সমবায় খামার খুলেছে। কুমিল্লা কো-অপারেটিভের এক বিশিষ্ট কর্তা সে। আমেরিকার সাহায্যে স্থাপিত হল তার কুমিল্লা অ্যাকাদেমি। খোন্দকারের সুপারিশে এই লোকটিই স্টেট সেক্রেটারির পদে আসীন হল। বাংলাদেশ মিশনের নীচের তলায় ছিল হোসেন আলির ঘর। এখানেই বসবার ব্যবস্থা হল মেহবুবের। ঠাকুর তাহেরউদ্দীন আর অধ্যাপক খালেদও এসে জুটল সেখানে।

বিশেষ কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে যখন বুঝতে পারল, মুক্তিযুদ্ধকে দমন করা অসম্ভব, তখন এক হীন কৌশল করল। একদিকে তারা মদত দিতে লাগল পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টাকে, অপরদিক নানা ধরনের ত্রাণ-সাহায্যের থলি নিয়ে ছদ্মবেশে ঢুকে পড়ল মুজিবনগর সরকারের মধ্যে। একটি মার্কিন সংস্থা তো নগদ টাকা দিতে লাগল দেশত্যাগী বুদ্ধিজীবীদের।

রিলিফ দেওয়ার নাম করে ওই সব বিদেশি সংস্থা বিদেশ মন্ত্রকের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে পড়ল। অনেকে আসে সাংবাদিক হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের অছিলায়। কিন্তু নানা যুক্তি-প্রমাণে এটা বিশ্বাস করায় অসুবিধা নেই যে, ওরা এভাবে মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফলে বিদেশি পৃষ্ঠপোষকতায় একটা দক্ষিণপন্থী চক্র মুজিবনগরে বেশ জাঁকিয়ে বসতে পারে। এবার শুরু হল তাজউদ্দীন সম্পর্কে নানা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভ্রান্ত কাজ করে। এমনকি, তাজউদ্দীন আর নজরুলের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করা হল কুৎসিত উপায়ে। অল্পদিনেই দলাদলিতে ভরে গেল মুজিবনগর। খোন্দকারের নির্দেশে মতলববাজরা মিলিত হত শলা-পরামর্শের জন্য হোসেন আলির ডেরায়। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর আর চাষী করতে লাগল নানা স্থানে ছড়ানো দক্ষিণপন্থী নেতা আর সমর্থকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা। আরও একটা জবর খুশির খবর অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। মুক্তিবাহিনীর নাম-কা-ওয়াস্তে

প্রধান কর্নেল ওসমানীর কাছে হাজির হয়েই তারা বুঝতে পারল সেটা। বুঝল ওই কর্নেলও সুযোগের পথ চেয়ে আছে পাশা উল্টে দেওয়ার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধে এই অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের ভূমিকাও অন্ধকারে থাকবে চিরদিন। মাঝে মাঝে এডিসি পরিবৃত হয়ে মুক্তিফৌজের ট্রেনিং দেখতে যাওয়া, কুচকাওয়াজে সেলাম নেওয়া আর ম্যাপের গায়ে লাল নীল পিন বসানো ছাড়া কোনো কাজ ছিল না কর্নেলের। অবশ্য বিশেষ নির্দেশে কখনো-সখনও কেবিনেট মিটিং-এ হাজির হতে হতো। সেক্টর কমান্ডাররা কখনো তার হুকুমের জন্য হাত গুটিয়ে থাকতেন না। মুজিবনগর সরকার যে সমর-কৌশলটা ছকে দিত মোটামুটি সেইটে অনুসরণ করে তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। অভিযানকালের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কী কৌশল নেওয়া দরকার, কখন আক্রমণ করার সুযোগ, কখন বা পিছিয়ে সাবধানতা নিতে হবে, এ-সবের কোনো নির্দেশদান কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সৈন্যদের কাছে উপস্থিত থেকে উৎসাহ যোগানো– এ সব হ্যাপা তার পোষাতো না। নন্দলালের তো নিজেকে তিনি মূল্যবান বস্তুর নিরাপদে রাখা কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন।

একটা ঘটনা বলছি। উনিশ শ' একাত্তরের তের ডিসেম্বর থেকে আবেগে উত্তেজনায় টগবগ করছে মুজিবনগর। সর্বত্র গেরিলাদের হাতে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী। একের পর এক এলাকা জয় করে নিচ্ছেন সেক্টর কমান্ডাররা। মিত্রবাহিনী এখন শত্রুকে শেষ-ধাক্কা দিতে ব্যস্ত। মুক্ত হচ্ছে জেলার পর জেলা। দশদিনের মধ্যে পাক দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণের আবেদন জানায়। এদিকে মিত্রবাহিনী আর সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনী সাঁড়াশির মতো ঘিরে ফেলেছে ঢাকা শহরকে। পনের তারিখ ঘোষিত হল, জেনারেল নিয়াজী ওই দিনই ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে তাঁর তিরানব্বুই হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করছেন।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে কর্নেল ওসমানীকে উপস্থিত থাকতে বললেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার, ওসমানী তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করল। শেষমুহূর্তে তাজউদ্দীন চীফ অব এয়ার স্টাফ এ কে খোন্দকারকে পাঠালেন ঢাকায়। ওই অনুষ্ঠানের আলোক-চিত্রাবলির মধ্যে একটিতেও ওসমানীর মুখখানা দেখতে পাওয়া গেল না।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি লোকের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। যদিও নিজেকে তিনি সব সময়েই আড়ালে রাখেন। ইনি সিলেট থেকে নির্বাচিত এমপি আবদুস সামাদ আজাদ। বিদেশি খেল আর দক্ষিণপন্থী কারসাজিতে মুজিবনগরের মধ্যে যখন দলাদলি খেয়ো-খেয়ি

চলছে, তখন এই দেশপ্রেমিক মানুষটি একা মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থে সকলকে দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করার ডাক দিয়েছেন। নিরলস চেষ্টা করে গেছেন ঐক্য বজায় রাখতে। একদিকে তিনি মন্ত্রিসভার সকল সদস্যকে ডেকে এনে মুখোমুখি বৈঠকে বসিয়েছেন, অপরদিকে মুজাফফর ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রভৃতি যে-সব দল ঐক্যের কথা তুলে মন্ত্রিপরিষদে স্থান দাবি করছিল তাদেরও সামলেছেন। এ-ব্যাপারে তিনি ভাসানীর সাহায্য চাইলেন। এক সর্বদলীয় সম্মেলনে ভাসানী বললেন, নির্বাচনে হেরে-যাওয়া লোকদের নিয়ে মুসলিম লীগ, জামাত-এ ইসলাম এবং পিডিপি'র উদ্যোগে গভর্নর মালিকের যে দালাল সরকার হয়, তাকে এতদিন আমরা সবাই নিন্দা করে এসেছি। তা ন্যায্যতই করা হয়েছে। আজ নিশ্চয়ই আমরা পরাজিত লোকদের তাজউদ্দীনের মন্ত্রিসভায় নেওয়ার জন্য চিল্লাতে পারি না। সব দলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য বরং সবাইকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা দরকার।

তাজউদ্দীন ভয় পাচ্ছিলেন, মন্ত্রিসভায় ভিড় বাড়লে দলাদলিও বাড়বে, খেয়োখেয়ি চলবে ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কেউ আর তখন মাথা ঘামাবে না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। আবদুস সামাদের প্রচেষ্টায়, ভাসানীর হস্তক্ষেপে ওই সংকট থেকে রক্ষা পেল তাজউদ্দীন সরকার। মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হতে চারদিকে দেখা দিল তার সমর্থনে প্রবল আন্দোলন। গ্রেটবৃটেন এবং আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিরা আন্দোলনে নামলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ, উদ্দীপনা, গণ-সমর্থনের মধ্যে কেউই টের পায়নি যে, বিদেশ দফতরের আনাচে-কানাচে ষড়যন্ত্রকারীরা ঘুর ঘুর করছে। দানা বেঁধে উঠছে একটা সর্বনাশা চক্রান্ত। মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার জন্য ওয়াশিংটন বিগ ব্রাদার্স রিপোর্টার, রিলিফ কর্মী প্রভৃতির ছদ্মবেশে তাদের চর পাঠিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু যখন একটা ঢিলেঢালা পাকিস্তানি কনফেডারেশনের মধ্যেই বাংলাদেশকে রাখবার জন্য ইয়াহিয়ার সঙ্গে খোন্দকারের ষড়যন্ত্রটা ফাঁস হয়ে যায়, তাজউদ্দীনের তখন কিছু বুঝতে বাকি রইল না। স্বাধীন হয়েই তিনি কোনো রকম মার্কিন সাহায্য নেওয়ার বিরোধিতা করে বিবৃতি দিলেন। এ দ্বারা তিনি মার্কিন সরকারের একটা গোষ্ঠী যে তাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত, সেদিকে দেশের সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিলেন।

স্বাধীনতার পর তাজউদ্দীন বিদেশমন্ত্রক থেকে খোন্দকারকে সরিয়ে দেন। মুজিবনগরের ষড়যন্ত্র তিনি ভুলতে পারেন না। সর্বদা তাঁর আশঙ্কা ছিল, ওই গুরুত্বপূর্ণ দফতর থেকে অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপন্থী জোটও ঠুঁটো হয়ে যাবে। এ নিয়ে খোন্দকার কয়েকদিন খুব হম্বিতম্বি করল। কিন্তু বড় বেশি কেউ কান দিল না তাতে।

এবার সে গেল বেগম মুজিবের কাছে তাজউদ্দীনের নামে বিষ ঢালতে। বলল, তাজউদ্দীন মুজিবের মুক্তি চাইছে না, তার ভয় মুজিব এলেই প্রধানমন্ত্রীর পদ খোয়াতে হবে, আর সেইটেই ওই ক্ষমতালোভী লোকটা হতে দেবে না। ভদ্রমহিলা বোধ হয় বিশ্বাস করলেন কথাটা। তাঁর পরিবারের অন্যান্যরাও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল তাজউদ্দীন সম্পর্কে। এক কথায়, তাজউদ্দীনকে আর বিশ্বাস করছে না মুজিব পরিবার।

এদিকে মুজিব ফিরে এলেন। তাজ সানন্দে তাঁকে বরণ করলেন নেতৃত্বে। মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলেন।

আর খোন্দকার? না, মুজিবও যেন তাকে ভরসা পাচ্ছেন না। বিদেশ দফতরের বাইরে তাকে থাকতে হল।

খোন্দকার ক্ষুব্ধ হল এতে। কিন্তু চালাক লোক। উচ্চবাচ্য করল না কিছু মুজিবের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা দেখে। বরং ডুব সাঁতার দিল সে। তার কাজ হল মুজিব আর তাজউদ্দীনের মধ্যে অবিশ্বাসের ঘোলাজল তৈরি করা।

আড়াইবছরের অক্লান্ত কসরতে খোন্দকারের কাজ হাসিল। উনিশ শ' চুয়াত্তরের শেষে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত এমপি আর পুলিশ অফিসারের চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন মুজিব। তাজউদ্দীনকে সরিয়ে দিলেন মন্ত্রিসভা থেকে। একজন মহান, আদর্শবান মানুষ বিদায় নিলেন। সংগ্রামের দিনে যিনি শত দুঃখবরণ করেছেন স্বাধীনতার জন্য, বিপদে দায় নিয়েছেন কাঁধে, গত পনের বছর ধরে যিনি ছিলেন মুজিবের ছায়া-সঙ্গী, সংকটে দিয়েছেন সৎপরামর্শ, যাঁর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত, সেই বিপদের বন্ধুকেই এ-ভাবে বিদায় দিলেন বঙ্গবন্ধু।

খোন্দকার শিবিরে সে কী উল্লাস সেদিন! দলের নেতৃত্বে একধাপ ডিঙিয়ে গেল সে। আর মুজিব? যিনি তাঁকে বর্মের মত রক্ষা করছিলেন, সেই সহচরকেই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ছাঁটাই করলেন নিজেরই একটা ডানা।

সেদিনটি আমার আজও চোখের 'পরে ভাসছে। দ্রুতগতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হল নতুন গণ-ভবনে। মুজিব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। উত্তেজনাময় পরিবেশ। কেবিনেট সেক্রেটারি তৌফিক ইমামকে দেখা যাচ্ছে একগাদা অফিসারের সঙ্গে ফাইল নিয়ে ছোটাছুটি করতে। সাংবাদিকদের তদারকে ব্যস্ত লিয়াজোঁ অফিসার তোয়াব। এমন সময় মুজিবের প্রবেশ। গোয়েন্দা দফতরের প্রধান ছুটে গেল তাঁর কাছে। নিবেদন করল– স্যার, তাজউদ্দীন সাহেব তাঁর সমর্থকদের নিয়ে আত্মগোপন করে আছেন, এড়িয়ে যাচ্ছেন পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে।

চিৎকার করে উঠলেন মুজিব। আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন– 'জেন্টেলম্যান, তাজউদ্দীনকে আমি পদত্যাগ করতে বলেছি। যদি সে তা না করে অবিলম্বে তাকে আমি মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করব।' পাইপে একটা দমকা টান দিলেন কথাগুলি বলে। দরজায় তখন আর এক মূর্তি ফাইল হাতে হাজির। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, কী চাই তোমার, হাতে কী নিয়ে এলে?

কেবিনেট সেক্রেটারি ইমাম সাহেব নরমসুরে কথা বলার লোক। ধমকে একেবারে মিইয়ে গিয়ে বলল– হুজুর, অর্থমন্ত্রী পদত্যাগপত্রে সই লাগিয়েছেন। তাঁর বাড়ি যেতেই আর দেরি করেননি। সেইটে আপনার সামনে পেশ করতে এসেছি হুজুর।

একটা গম্ভীর পরিবেশ। আমরা কেবল এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি।

উনিশ শ' বাহাত্তরের জানুয়ারির সেই দিনগুলি আমি ভুলতে পারি না। মুজিব কেবল দেশে ফিরেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে তাঁর শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান হচ্ছে বঙ্গভবনে। তাজউদ্দীন সপরিবারে সে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন। তাঁর মুখাবয় আনন্দে উজ্জ্বল। হেসে হেসে সবার সঙ্গে কথা বলছেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে এগিয়ে তিনি বললেন, আমার জীবনের আজ সবচাইতে আনন্দের দিন। আমাদের নেতা যখন কারান্তরালে, তাঁর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পেরেছি, মুক্তিযুদ্ধে সফল হয়েছি। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদে ছিলাম তাঁরই অপেক্ষায়। আজ তাঁর যোগ্য হাতে সে-দায় দিতে পারলেম, এ-ই আমার আনন্দ। যত নগণ্যই হোক, ইতিহাসে অন্তত এইটুকু স্থান আমার রইল।

হায়, ইতিহাস! তিন বছর পর সেই তাজকে তাড়িয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু। তাজের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী জনগণ হারাল মন্ত্রিসভায় তাদের পরম বন্ধুকে। জাতীয়তাবাদী কণ্ঠ ক্ষীণতর হল কেবিনেটে। মুজিবুর রহমানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের অব্যবহিত পরেই তাজউদ্দীনের অপসারণ-ব্যাপারটার মধ্যে কেমন একটা কুৎসিত চক্রান্তের আভাস মেলে। সেদিন মুজিব জানালেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য সরকার এবার নতুন ব্যবস্থা নেবেন। এরপরই সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করে দিলেন। ব্যস, আমরা বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কে এম ওবায়েদ, তাহেরউদ্দীন ঠাকুর আর খোন্দকারকে দেখা গেল সদলে মুজিবের ঘরে ঢুকতে।

পরদিন ঢাকার বেশ কয়েকটি খবরের কাগজ একযোগে আক্রমণাত্মক বিষোদগার করল তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য সব দায় তাজউদ্দীনের– এ-ই তাদের জেহাদের জিগির।

যে-কোনো সংসদীয় প্রথায় বাজেট তৈরি হয় কেবিনেটের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী। তারপর তার অনুমোদন দরকার মন্ত্রিসভায়। সেখানে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার পূর্ণ বয়ান পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়ে দেখা হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি নয়, গোটা কেবিনেট দায়ী বাজেটের জন্য, দেশের আর্থিক নীতি সম্পূর্ণ সরকারি নীতি কিন্তু বিচিত্র বাংলাদেশে কার কথা কে শোনে!

মুজিবনগর দক্ষিণপন্থীদের দখলে গেল। চক্রান্তকারীরা এবার দাবড়ে বেড়াতে লাগল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে। তাজউদ্দীনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অধ্যায়। এর পরের অধ্যায়? মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র– যা সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায়।

৪

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অনুন্নত দেশগুলিতে বা তৃতীয় বিশ্বে আইনসঙ্গতভাবে গঠিত সরকারের উচ্ছেদ বা রাজনৈতিক নিধনপর্বের পিছনে শক্তিশালী খবরের কাগজগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

উনিশ শ' একাত্তরের গণহত্যা অভিযানের সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা ইত্তেফাক অফিসকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। ইয়াহিয়া ভুলটা বুঝলেন। তিনি ওদের দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেন।

কাজ হল। মানিক মিয়ার বড় ছেলে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন টাকা নিয়ে অফসেট রোটারি মেশিন আনতে ইংল্যান্ড আর পশ্চিম জার্মানি ঘুরে এল। ফিরে এসে ডেইলি পাকিস্তান প্রেস থেকে বার করতে লাগল ইত্তেফাক। দেখা গেল ভোল বদলে গেছে। ইত্তেফাক ইয়াহিয়া আর টিক্কা খাঁর প্রচারপত্রে পরিণত। তাদের নিত্যকর্ম হয়ে উঠল মুক্তিযোদ্ধাদের নিন্দা।

হঠাৎ একদিন ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এবং সাপ্তাহিক হলিডে'র সম্পাদক এনায়েতুল্লাকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। কারণ আপাত-রহস্যাবৃত। ক'দিনের মধ্যেই দুটি বিদেশি দূতাবাসকে হস্তক্ষেপ করতে দেখা গেল ব্যাপারটায়। এবং হঠাৎ তারা ছাড়া পেল। শোনা গেল, ওরা নাকি পাকিস্তানি সামরিক শাসনের পক্ষে প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাগজ দু'খানির পরবর্তী ভূমিকা ওই সন্দেহ সপ্রমাণ করে। হলি-ডে তো মুজিবের ছয় দফা দাবিকেই মার্কিন মস্তিষ্ক-প্রসূত বলে আক্রমণ করতেও কসুর করল না। এ-দিকে ভুট্টোর পিপলস পার্টি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আসলাম নামে এক সাংবাদিকের আবির্ভাব ঘটল ঢাকায়। লোকটি বাংলায় চোস্ত। মুখে বেশ প্রগতিশীলতার বুলি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ভূমিকা ছিল সন্দেহজনক। স্বাধীনতার পর ভূট্টোর বাংলাদেশ সফর স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল আসলাম। কোথায় হঠাৎ গা ঢাকা দিল লোকটি? পার্লামেন্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, লোকটি লন্ডন হয়ে পাকিস্তানে কেটে পড়েছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ, পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে লোকটি ভুট্টোর

এজেন্ট হিসেবে ওই কাজ করে যাচ্ছিল। নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি চরদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পাক-গুপ্তচর চক্রটাকে তৎপর রাখাই ছিল তার কাজ। এ-ই তার আসল সাংবাদিকতা।

আবার হলিডে সম্পাদককে দেখা গেল নানা বৈদেশিক নিমন্ত্রণ রক্ষায় ছুটছে। আজ পশ্চিম জার্মানি, কাল হল্যান্ড, পরশু বেলজিয়াম, পরদিন গ্রেট ব্রিটেন। সপরিবারে আমেরিকা ঘুরতেও দেখা গেল তাকে। সে-সব জায়গায় তার চলাফেরা ছিল সেই সব 'সাংবাদিকদের' সঙ্গে, যাদের আসল বৃত্তি অন্য-কিছু বলেই সকলের সন্দেহ।

এরা এদের পত্রিকার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশে অবস্থানকারী বাঙালিদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াতে চেষ্টা করে। মুজিবের সমালোচনা করে, আবার মুজিব তাজউদ্দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বিষ ছড়ায় তাজউদ্দীনের নামে। মুজিব যখন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এরাই এগিয়ে এসে তাকে সমর্থন জানায়, প্ল্যান কষে দেয়। এনায়েতুল্লা তো দালালির চূড়ান্ত নকশা করে, প্রেস অ্যাডভাইসার হয়ে বসেন গণভবনে। ধূর্তদের এইসব হীন কাণ্ডকারখানার দিনেও অবশ্য অল্পকিছু দেশপ্রেমিক সৎ সাংবাদিক লড়াই করে যাচ্ছিলেন। মুজিবকে যিনি সত্যিই ভালোবাসতেন, সেই দৈনিক জনমত সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরী সেদিন কিন্তু ওইসব স্তাবক পরিবৃত মুজিবকে সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি সম্পাদকীয় লিখলেন– 'ক্ষমা করো প্রভু।' গাফফার চৌধুরী মুজিবের এক-দলীয় শাসন ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের তীব্র বিরোধিতা করলেন ওই সম্পাদকীয়তে। এ-দিকে স্তাবক এনায়েতুল্লা সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন গণভবনে।

পরে অবশ্য গোয়েন্দা রিপোর্টে ধরা পড়ে, ওই লোকটি এক বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। নিরাপত্তা আইনে তাকে গ্রেফতারও করা হয়। আশ্চর্য, আবার তার জন্য এক বিদেশি দূতাবাসকে ব্যস্ত হতে দেখা যায় এবং তাদের চেষ্টাতে অল্পদিনেই সে জেল থেকে বেরিয়ে আসে।

মোনায়েম খানের চ্যালা খোন্দকার আবদুল হামিদ খাঁ– যে নাকি আয়ুব খাঁর বুনিয়াদি গণতন্ত্রের সমর্থক এবং তার জামানায় মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচিত হয়, আবার পরে হয় ইয়াহিয়ার লোক– তাকেও মুজিব দয়া দেখিয়ে জেল থেকে বার করে আনলেন। সে ইত্তেফাকে সাংবাদিকতা শুরু করল। মুক্তিযুদ্ধের সময় করাচির ডন পত্রিকার ঢাকার সংবাদদাতা হিসেবে যে মাহবুব আলম নিয়মিত ঢাকা রেডিও মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করত, সে-ও ক্ষমা পেল, কাজ পেল বাংলাদেশ টাইমস-এ। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ অবজারভার-এর তৎকালীন সম্পাদক

ওবায়েদুল হক আর এক ব্যক্তি– যার কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো। হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভোল বদলে দেরি হয় না এদের। সেই ওবায়েদুলকেই দেখা গেল, মুজিবের স্তবগান জুড়ে দিয়েছে। এমনকি, ইংরেজিতে এক মুজিববন্দনা গান পর্যন্ত লিখে ফেলল। সেটি আবার ছাপিয়ে বাঁধিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল বঙ্গভবনে। আবার যেদিন মুজিবকে হত্যা করা হয় তার পরদিন প্রথম পাতায় বিরাট সম্পাদকীয় লিখে সেই একই ওবায়েদুর বলল, 'অবশেষে এক অশুভ প্রভাব থেকে দেশ মুক্তি পেল।'

এদের কীর্তি সব বলতে গেলে আর শেষ হবে না। উনিশ শ' একাত্তরে মুজিবের বিরুদ্ধেই ইয়াহিয়ার সাজানো মামলার প্রধান সাক্ষী ছিল শফিউল বারি। দয়ার শরীর মুজিবকে ভজিয়ে সেই শফিউলই আসীন হল বাংলাদেশ রেডিওর বার্তা বিভাগের নিয়ন্ত্রকের আসনে।

আয়ুবের 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস' বইয়ের আসল লেখক রাওয়ালপিন্ডির পাকিস্তান কাউন্সিলের প্রাক্তন ডিরেক্টর নামজুদ্দীন হাসেম। তাহেরউদ্দীন ঠাকুরের জোর সুপারিশে সেই ব্যক্তিকেই করা হল বিদেশমন্ত্রকের প্রচার শাখার ডিরেক্টর জেনারেল।

এমনি করে মুজিবের উদারতার সুযোগ নিয়ে তথ্য ও বেতারমন্ত্রক থেকে বিদেশমন্ত্রক পর্যন্ত সর্বত্র চরে ভরে গেল।

বাহাত্তরের মাঝামাঝি, রোজকারের মত আমি কিছু বাংলাদেশি সাংবাদিকের সঙ্গে গণভবনে গিয়েছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের ডেকে বললেন– শোন, যত রাজাকার আর আলবদর আছে আমি সকলকে অবিলম্বে অ্যারেস্ট করার হুকুম দিয়েছি।

আমাদের মধ্যে একজন শুনেই বলে ফেলল, স্যার, মতলববাজ অফিসাররা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে।

মুজিব গর্জে উঠেলেন– কী বলতে চাও তুমি? সাংবাদিকটি সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, আমাকে মাফ করবেন স্যার। যে ইন্সপেক্টররা আপনার হুকুম তামিল করবেন, তারাই কিন্তু হাত মিলিয়েছিল পাকিস্তানের চরদের সঙ্গে। দেশপ্রেমিক পুলিশ অফিসারদের বেশিরভাগই প্রাণ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। আর একদল মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে খুঁজে খুন করেছে রাজাকার-আল বদরদের সহায়তায়, তারাই এই সরকারে নানা পদে বসেছে। তারাই মুখ্যসচিব শফিউল আজাদের সাহায্যে রাজাকারদের এনে বসিয়েছে নানা জায়গায়। এবার আবার রাজাকারের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের ওপরই আক্রমণটা চলবে বলে আশঙ্কা।

মুজিব ভুরু কোঁচকালেন। এমন সময় নাক গলিয়ে দিল সেই খোন্দকার। সে বললে, না না, সে কেমন করে হবে। গ্রামে গ্রামে আমাদের দলের ক্যাডাররা রয়েছে না। তারাই সব ধরিয়ে দেবে।

আসল ক্যাডাররা তখন কী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে আর কারা তখন দখল করে নিয়েছে পার্টি ইউনিটগুলি, সেটা সবাই জানত। ঘোষণাটি খুব মুখরোচক হলেও আসলে এ-ও ছিল দেশপ্রেমিকদের শায়েস্তা করতে দক্ষিণপন্থীদের এক চাল।

মুজিব এবং তাঁর পরিবারকে হত্যা করার পর এটা বেশ স্পষ্ট, ষড়যন্ত্রকারীরা একটা ছক এঁকে কাজ চালিয়ে গেছে। বিদেশ দফতরটা ছিল চরদের মূল আড্ডা। মুক্তিযুদ্ধের সময় দিল্লির পাক হাইকমিশন থেকে সব বাঙালি কর্মচারী বেরিয়ে আসে, দু'জন অফিসার ছাড়া। তাদেরই একজন হামিদুল হক চৌধুরীর জামাই রিয়াজ রহমানকে দেখা গেল ফিরে আসতেই বিদেশ দফতরে এক উচ্চপদ উপহার পেতে। এই ধরনের বহু ব্যক্তিকেই সেদিন সাদরে গ্রহণ করে বিদেশমন্ত্রক।

৫

পাকিস্তান সরকারে অধীনে যে-অফিসাররা অ্যাদ্দিন বশংবদের মত কাজ করছিল, তাদের চাকুরির সব সুযোগ-সুবিধা, সিনিয়রিটি ইত্যাদি অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ সরকারি কাজে পুনর্বহালের যে-দিন সিদ্ধান্ত হয়, সেইদিনই হল মুজিবের রাহুগ্রাসের সূচনা।

রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশগুলির কেউই পরাভূত সরকারের সামরিক বা অসামরিক ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে নয়া সরকারে নেয় না। সে ফিডেল কাস্ট্রো বা মাও সে-তুঙ, যিনিই হোন বিপ্লবী সরকারের বৈপ্লবিক নীতি-কর্ম রূপায়ণে উপযুক্ত নতুন লোক নিয়েই তাঁরা অভিযাত্রা শুরু করেন। তাই একদিকে তাঁরা পারেন পরাভূত শত্রুর অবশিষ্ট চরদের পরবর্তী ষড়যন্ত্রসমূহ বানচাল করতে, অপরদিকে পারেন নিজেদের লক্ষ্যের দিকে স্থিরভাবে এগোতে। কেউ কেউ এজন্য চরম নির্মমতা দেখাতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। কম্বোডিয়ার বিপ্লবী সরকার নাকি এজন্য পাঁচ হাজার অফিসারকে খতম করে দিয়েছে।

কিন্তু বিচিত্র এই বাংলাদেশ। পূর্বেকার অভিজ্ঞ লোকদের না-হলেই না-কি চলবে না নয়া সরকার। ইত্তেফাকের মতো কাগজগুলি তো ওই যুক্তিতেই তদ্বির শুরু করল। কিন্তু কিসের অভিজ্ঞতা? দুর্নীতির, পাকিস্তানের চরবৃত্তি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, গণহত্যার সহায়তার।

খোন্দকার চক্রের তৎপরতায় কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ সরকারের হেড কোয়ার্টার ইডেন বিল্ডিংস-এ সেই পরিচিত গোঁফগুলি আবার দাঁড়া নাড়তে লাগল। মুক্তিফৌজকে ভেঙে দেওয়া হল তাদের প্রথম কাজ। বলতে লাগল, মুক্তিবাহিনীর ছোকরাদের জব্দ না করতে পারলে ওরা যে-ভাবে বেড়ে উঠেছে, তাতে ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলা থাকবে না কিছু। দেশপ্রেমিক ওই তরুণরা এদের চিরশত্রু হবে এটা স্বাভাবিক।

একটি ঘটনার কথা আমার এই সূত্রে মনে পড়ছে। তিয়াত্তরের প্রথম দিক। এক বিকেলে আমি আর কয়েকজন সাংবাদিক বঙ্গভবনের ব্যালকনিতে মুজিবের সঙ্গে কথা বলছি। সামনে সবুজ লনে অস্তসূর্যের রঙ। মুজিব তার

সাম্প্রতিক যশোর সফরের একটি বিশেষ কাহিনি শোনালেন : মিটিং সেরে আমি সার্কিট হাউসে ফিরে আসছি। লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নামতেই জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হল। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একজন এগিয়ে এসে সালাম করল আমাকে। কে? মুখটা যেন চেনা-চেনা! নির্মল না?

হ্যাঁ, সেই নির্মল। তেত্রিশ বছর আগে আমরা গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে খেলতাম। তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে নিলাম। নির্মল ছিল আমাদের স্কুলের ফুটবল টিমের সেন্টার-হাফ। এই যশোরেই ফাইনাল খেলতে এসেছিলাম। দারুণ খেলা হয়েছিল। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও সেদিন আমরা জিতেছিলাম এই নির্মলের জন্য। অতীত স্মৃতি নিয়ে দুজনে কথা হতে থাকল। এক সময় আমিই জানতে চাই, তা এখন কী করছ? নির্মল বলল, পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলাম, এখন অবসরপ্রাপ্ত।

আমার খটকা লাগল। – তোমার তো রিটায়ার করার বয়স হয়নি!

সে বলল, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমি ছিলাম এই জেলারই একটি থানার সেকেন্ড অফিসার। চীফ ইন্সপেক্টর হল জামাত দলের সমর্থক। সে আমাকে চাকরি থেকে তাড়াবার এক হীন ষড়যন্ত্র করে। আমি যখন জানতে পারি, আমি মুজিবনগরে পালিয়ে যাই। যুদ্ধের নয় মাস সেখানেই কাজ করি। যুদ্ধের পরে ফিরে এসে কাজ পেলাম সেই ষড়যন্ত্রকারী অফিসারের অধীনেই। এবার আমার মনোবল ভেঙে গেল। পদত্যাগ করলাম। আগে জীবনে তো বাঁচি। বঙ্গবন্ধু বললেন, শুনেই আমি ডিআইজিকে তলব করলাম। বললাম, একে প্রমোশন দিয়ে দিন। নির্মল প্রায় আমার পা ধরে ফেলল– মাফ চাইছি, প্রমোশন চাই না। ইন্সপেক্টর আমাকে যে-কোনোভাবে হোক শেষ করবে। তবে হ্যাঁ, যদি অন্য কোনো জেলায় দেন, কাজ করব। মুজিব বললেন, নির্মলকে আমি বরিশালে বদলির নির্দেশ দিয়েছি।

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, জানো বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়া কঠিন কাজ; কিন্তু একবার চড়ে বসলে তার পিঠ থেকে নামা আরও কঠিন। হয় তুমি বাঘকে বাগ মানিয়ে রাখবে, না-হয় বাগে পেলে সে তোমায় খেয়ে ফেলবে। মাঝামাঝি কোনো উপায় নেই।

আবার চুপ। বললেন, এবার আমায় বলো, আমার প্রশাসনে কোথায় ত্রুটি।

সাংবাদিক গাফ্ফার চৌধুরী এবার মুখ খুললেন– গোস্তাকি মাফ করবেন স্যার, আপনার দিলটা হল শের-এ বাঙ্গাল ফজলুল হকের মতো– মায়ের

হৃদয়। আপনি যদি শাহানশা আওরঙ্গজেবের মত নির্মম হতে পারতেন অনেক কাজ করতে পারতেন এদেশে। আর একজন সাংবাদিক এবার ভরসা পেয়ে বলল, কাদের প্রতি দয়া দেখাচ্ছেন, আপনি ভেবে দেখছেন না, স্যার। ওরা সব বিষাক্ত সাপ।

এবার মুজিব চেঁচিয়ে উঠলেন– তোমরাই তো আমাকে শেষ করে দিয়েছো। কেন আমাকে 'জাতির পিতা' বানালে?

পাইপটা টেবিলে ঠুকে রেখে দিলেন মুজিব। তারপর বললেন, দেখ, একটা কথা বলে রাখছি। চিলিতে ওরা আলেন্দেকে শেষ করেছে। কিন্তু অত সহজে আমাকে সরানো যাবে না। নিজ থেকে যদি আমি কখনো সরে আসতে চাই, তখন সেনাপ্রধানরা এসে বলবে, 'এতদিন আপনি সরকার চালিয়েছেন। এখন ক্লান্ত। এই কাগজে সই করুন। চিরদিন আপনি জাতির পিতা হয়ে থাকবেন।' এভাবেই তারা আমার সইটি বাগাবে। তারপর কী হবে বুঝবে। তোমাদের মতো জাতীয়তাবাদীদেরই আগে জবাই দেবে তারা। তখন আমার মূল্য বুঝবে যখন আমি থাকব না। এখন সবাই চালার তলায় আছে। চালাখানা না থাকলে বুঝতে পারবে বাইরের তুফান কী ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করে।'

কিছুদিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ সচিব হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকা এলেন সফরে। বাইশঘণ্টা মাত্র রইলেন। গণভবনে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেন, সেখানে খুব সীমাবদ্ধ কয়েকটি কথা বললেন। কিন্তু যে-কটি কথা, তা কেবল মুজিবের প্রশংসা। তাজউদ্দীনের প্রস্থান ও কিসিঞ্জারের মুজিব প্রশস্তি কেমন যেন তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল সেদিন অনেকের।

তাজউদ্দীনের বাড়িতে বসে একদিন কিসিঞ্জারের ঢাকা-সফর নিয়ে কথা হচ্ছিল। টাইমস অব ইন্ডিয়ার ঢাকার সংবাদদাতা কিরীট ভৌমিকও সেখানে ছিল সেদিন। দেখলাম, ব্যাপারটা তাজউদ্দীনের খুব লেগেছে। তিনি ক্ষুব্ধ। বললেন– আমাদের বিদেশমন্ত্রক এবং মার্কিন দূতাবাস থেকে দু'দুটো পার্টি দিল কিসিঞ্জারের সম্মানে। পার্লামেন্টের সকল সদস্যই আমন্ত্রিত ছিলেন, বাদ দেওয়া হয়েছে কেবল আমাকে। বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে তাজের। বললেন দ্যাখো, আমাকে বাদ দিয়েছে ওরা বেশ করেছে, কোনো দুঃখ নেই তাতে। আমি জানি, কলকাতা থেকে আমরা যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালাচ্ছি, তখন ওই কিসিঞ্জারই পাকিস্তানকে সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছে। তবু একবার আমার কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। তাকে শুধু বলতাম– দেখে যান, আপনাদের সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।

দুর্ভিক্ষ দেখা দিল বাংলাদেশে। আমেরিকার প্রতিশ্রুত খাদ্য যথাকালে পৌঁছল না। না-খেয়ে মরতে লাগল হাজার হাজার বাঙালি। মুজিব বুঝল, এভাবেই নাস্তানাবুদ করে আমেরিকা তাঁকে তাদের হাতের পুতুল বানাতে চায়। সব বুঝেও তিনি তখন অসহায়। হাজার হাজার প্রাণ দুর্ভিক্ষের গ্রাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে, চোখের 'পরে দেখতে হল মুজিবকে। অথচ আশ্চর্য, তবু ওরা মৃত্যুর আগেও অভিশাপ দিচ্ছে না ওদের বঙ্গবন্ধুকে। চোখের জল রাখতে পারছেন না মুজিব। রংপুর ত্রাণ-শিবিরে গিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন জাতির পিতা।

এ-সময় কিছু বিদেশি সাংবাদিক এসে গেল বাংলাদেশে। তারা দেশে বার্তা পাঠালো মুজিব সরকার ব্যর্থ হয়েছে। হাজার হাজার নরনারী যখন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে মৃত্যুবরণ করছে, তখন লক্ষ লক্ষ ডলারের বিদেশি সাহায্য দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা লুটে-পুটে স্ফূর্তি করছে।

উদ্দেশ্যটা একই। বাইরে মুজিবের ভাবমূর্তিটায় কালি ছিটানো। কেউ ওদের জবাব দিল না যে– বাপু, যা দিচ্ছি বলে ঢাক পেটাচ্ছ, তা তো হাত ঘুরিয়ে নিয়েই নিচ্ছ ফের। মোট সাহায্যের শতকরা আটত্রিশ ভাগই চলে যেত ওইসব দাতাকর্ণদের বিমান ভাড়া, কর্মীদের রাহা খরচা এবং ত্রাণ সেবকদের থাকাখাওয়া গাড়ি-চড়ার বাবদে। বাদবাকি যা, তারও শতকরা পনের ভাগ অব্যবহার্য। যেমন, বাংলাদেশের মেয়েদের তখন পরবার শাড়ি পর্যন্ত নেই। ওরা পরবার জন্য পাঠালো স্কার্ট, গাউন, বিকিনি। বাংলাদেশের গ্রামের মেয়ে-বউ চায় শাড়ি!

এই শাড়ি কেনার ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে এক তিক্ততা ঘটল আশ্চর্যভাবে। ভারত থেকে শাড়ি কেনার জন্য ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার সুবিমল দত্তর উদ্যোগে পাঁচকোটি টাকা অনুদান মঞ্জুর করল ভারত সরকার। ঢাকার একদল সিনিয়র অফিসার এসে কলকাতা, বোম্বের মিলগুলি দেখল। তারা শাড়ির বদলে কিনল বড় বড় গামছা। ঢাকায় প্যাকেটগুলি পৌঁছলে ভারতের 'পরে চটে গলে সবাই। এটা যেন ভারতেরই কারসাজি। মুজিব ভারত সরকারকে অভিযোগ জানালেন। তলব করা হল সুবিমল দত্তকে। ষড়যন্ত্রটা ফাঁস হল।

কিন্তু ওই নিয়েই এদিকে মৌলানা ভাসানী ভারতের বিরুদ্ধে জোর জিগির তুললেন। অথচ এই লোকটিই ন'মাস বেশ বিলাসবহুল ব্যবস্থায় কাটিয়ে গেছেন কলকাতায়। যথেষ্ট তোয়াজে রাখা হয় তাকে। মৌলানার হাওয়া বদল দরকার তাই বিমান বাহিনীর একখানি বিমান তাকে দেওয়া হয় নৈনিতাল, মুসৌরি এবং দেরাদুন যাতায়াতে। ঢাকা মুক্ত হওয়ার তিন সপ্তাহ

পরে নির্ঝঞ্ঝাটে তিনি ফিরে আসেন। টাঙ্গাইলে নিজের বাড়ি পৌঁছে ভাসানীর মাথায় হাত। তার ঘর গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে পাকিস্তানি সৈন্য।

ইতোমধ্যে সুবিমল দত্ত ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। হঠাৎ টাঙ্গাইল থেকে ভাসানীর এক চিঠি। তিনি সুবিমলবাবুকে টাঙ্গাইলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন। সুবিমলবাবু ভাসানীকে উত্তরে জানালেন, অফিসের কাজে ঢাকায় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। যদি তিনি বলেন, একজন পদস্থ অফিসার পাঠানো যেতে পারে। ভাসানী তাতেই রাজি হলেন। সুবিমলবাবু তখন হাইকমিশনের উচ্চপদস্থ অফিসার চন্দ্রশেখর দাশগুপ্তকে পাঠালেন। এটা বাহাত্তরের মার্চ মাস।

মৌলানা সাহেব চন্দ্রশেখরবাবুকে বললেন, পাকিস্তানি সৈন্য তার বাড়ি-ঘর মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এখন তাঁর অন্তত হাজার চল্লিশেক টাকা নগদ এবং বস্তা তিরিশেক সিমেন্ট ও কিছু লোহালক্কর না-হলেই নয়। ভারত সরকারের কাছ থেকে এটা পাইয়ে দিতে হবে। কূটনৈতিক বাধা-নিষেধের জন্য দাশগুপ্ত সরাসরি কিছু বলতে পারলেন না। তিনি এসে সুবিমল দত্তকে জানালেন। সুবিমলবাবু ভাসানীকে লিখলেন, বাংলাদেশ এখন স্বাধীন, সার্বভৌম। তার অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে ভারত সরকার ওইরকম কোনো টাকাকড়ি বা জিনিসপত্তর দিতে পারে না। তবে যদি বাংলাদেশ সরকার বলে, ভারত সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে। সুবিমলবাবু তার এই চিঠির অনুলিপি বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকেও পাঠিয়ে দিলেন।

ভাসানীর গোঁসা হল। ওই দিন থেকেই মৌলানা সাহেবের ভারত-বিরোধী জেহাদ শুরু। ভাসানীর এই অপ-অভিযানের বিষয়ে আমি বাহাত্তরের এপ্রিলে একদিন শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেছিলাম। শেখ সাহেব বললেন, ওই বৃদ্ধকে গ্রেফতার করে আমি তাঁকে শহীদ বানাতে চাই না।

উনিশ শ' পঁচাত্তরের পয়লা জানুয়ারি বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হল। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে সেখান থেকে নগদ সাহায্য আনা, দেশে শিল্পোন্নয়নে ও কৃষিক্ষেত্রে আরও গুরুত্ব আরোপ করা। খাদ্যের জন্য বাফার স্টক রাখা– এসব উদ্দেশ্যকে সফল করতে এবং প্রশাসনকে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী চাঙ্গা করতেই মুজিব এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন।

কিন্তু দেশের মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ ভালো চোখে দেখল না এটা। এদিকে শিল্পক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্রে কিছু করতে পারা গেল না। সমস্যা রয়েই গেল। সেই সঙ্গে যত দোষ নন্দঘোষ,

অর্থাৎ ভারতের এমনি একটা বিদ্বিষ্ট প্রচারও চলতে লাগল বিশেষ চক্র থেকে। শেখ সাহেবও তা মর্মে মর্মে বুঝলেন।

মুজিব যে একদলীয় শাসন কায়েম করলেন, তার পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। চুয়াত্তরে প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর পদত্যাগের পরই মুজিব ওয়াশিংটন পৌঁছলেন। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই চাননি। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড মাত্র দশটি মিনিট ব্যয় করতে রাজি হন। এতে অপমানিত বোধ করেন মুজিব। ওয়াশিংটন যাত্রার আগে মুজিব এ-সম্পর্কে তাজউদ্দীন এবং কামরুজ্জামানের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা দুজনেই মুজিবকে জাতিসংঘে ভাষণ দেওয়ার পরামর্শ দেন। মুজিব তা শুনলেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁকে দেশে ফিরতে হয়।

এরকম একটা মওকার অপেক্ষাই করছিল সোভিয়েত সরকার। ওই সময় ফজলুল হক মণি ছিল শেখ সাহেবের একান্ত উপদেষ্টা। স্বাধীনতার পরই সে দু'দুটো খবরের কাগজের মালিক হয়ে গেল কী করে। তার ঘনিষ্ঠতা ছিল রুশ দূতাবাসের সঙ্গে। সে-ও এই সুযোগটা নিল। এদিকে বাংলাদেশে মণি সিং-এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি ও মুজাফফর ন্যাপ তিয়াত্তরের নির্বাচনে একটি আসনও না পেয়ে যে মার খেল, তা থেকে বাঁচার জন্য ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হতে একটা সুযোগ চাইছিল। ওইসব শক্তি তৎপরতায় সফল হল। চার পার্টি মিলিয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করলেন মুজিব। ব্যাপারটায় আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতারা মোটেই খুশি হলেন না। দলের সভায় তারা প্রশ্ন তুলল, সোভিয়েতপন্থীদের এভাবে ভিড়ানো হল কেন? কিন্তু মুজিব তার জবাব দিলেন না।

দেশের বৃহত্তম স্বার্থের নামে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব বিলোপ হল। মুজিব তাঁর জীবনের আঠাশটি বছর ব্যয় করেছেন এই দলকে গড়ে তুলতে। হাজার হাজার নিষ্ঠাবান কর্মী ও নেতা তৈরি হয়েছে এই দলের মাধ্যমে। এই আওয়ামী লীগই দেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক, তারাই এনেছে দেশের স্বাধীনতা।

এর পরিবর্তে জন্ম নিল 'বাকশাল'। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মুজাফফার), সিপিবি, যুবলীগ, শ্রমিকলীগ, কৃষকলীগ, এমনকি ছাত্রলীগও এসে মিশে গেল 'বাকশাল'-এ। ছাত্র থেকে সামরিক অফিসার-সবাই বাকশাল। সরকার যখন ঘোষণা করল টাঙ্গাইলের সন্তোষে ইসলাামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে, ভাসানী মৌলনা সেদিন 'মোবারক' জানালেন নয়া দলকে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই নতুন দলে তাঁর যোগদানের

কথা ঘোষণা করলেন। সাড়ে তিনশ' সাংবাদিক গণভবনে ছুটে গেল বাকশালের সভ্য হতে। ঢাকার পত্রিকাগুলি ঢাক পেটাতে লাগল। পার্লামেন্টের সদস্যরা সবাই এসে লাইন ধরল। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়ে শুকরিয়া জানালো স্যাঙাতদের। সে এক এলাহি ব্যাপার চলল।

দূরে রইলেন শুধু একজন– তাজউদ্দীন। আর একজন– তাজের সঙ্গে যিনি ছিলেন সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা, সেই বিদেশমন্ত্রী কামাল হোসেন নীরবে এই দৃশ্য দেখে চলে গেলেন অক্সফোর্ডে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে। আর একজন সাংবাদিক– আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী মুজিবের এই কাজের সমালোচনা করে লন্ডন পাড়ি দিলেন।

একশ' সদস্যেরা কেন্দ্রীয় কমিটির উপরে তেরজন সদস্য নিয়ে হল বাকশাল পলিটব্যুরো। দল, সংসদীয় সংস্থা, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি সব ছাপিয়ে সর্বশক্তিমান হল এই পলিটব্যুরো। স্বাধীনতার পর তিনি দু'দুটি সংবাদপত্রের মালিক হয়েছিলেন। এ থেকে যারা বাদ পড়ল, স্বভাবতই তারা এ নিয়ে মুজিব-বিরোধী ঘোঁট পাকাতে লাগল। এদিকে একদলীয় শাসন কায়েম করেই মুজিব হাত দিলেন প্রশাসনকে পুরো ঢেলে সাজানোতে। গোটা দেশ বিন্যস্ত হল বাষট্টিটি জেলায়। জেলা প্রশাসনের মাথায় একজন করে গভর্নর। দু'শো বছরের পুরানো প্রশাসন কাঠামো পুরো ভেঙে দেওয়া হল। গভর্নররা ক্ষমতাধর হয়ে গজিয়ে উঠল নতুন করে। শহরকেন্দ্রিক ক্ষমতা চলে গেল বাইরে। শহরের সুবিধাভোগী সমাজ, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মানুষদের রোষানলে পড়লেন এতে মুজিব। চটে গিয়ে মুজিব ঢাকার এক সমাবেশে শহুরেদের আক্রমণ করলেন তীব্র ভাষায়। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। ফলে ক্ষমতাচক্রের বাইরের রাজনীতিক ঘুঘুরা, সুযোগ হারানো সুবিধাবাদী শহুরে, সবাই একজোট হল মুজিবের বিরুদ্ধে। এমন একটা মওকার জন্য অপেক্ষা করছিল কোনো কোনো বিদেশি শক্তি। তারা হাত বাড়িয়ে দিল এবার। কলকাঠি নাড়তে শুরু করল মুজিব সরকারের পতন ঘটাতে।

৬

এ-সময়কার পুলিশ বিভাগের কথা লিখতে গেলে আলাদা বই হয়ে যায়।

দেশপ্রেমিক পুলিশ অফিসারদের বেশিরভাগই আত্মাহুতি দেয় মুক্তিযুদ্ধে। অল্প যারা বেঁচে যায়, দেশ স্বাধীন হলে তারা দেখল, পাক-বাহিনীর দোসর অফিসাররাই জাঁকিয়ে বসেছে ফের। কলমের এক খোঁচায় মাফি মিলেছে শত্রুর সাথী ওই সব পুলিশ অফিসারদের। সাবাস।

পাক-বাহিনীর সহযোগী ঢাকার প্রাক্তন এসপি ইনাম পেয়ে গেলেন গোয়েন্দা বিভাগের ডিআইজি-র পদটি। আগরতলা ষড়যন্ত্র-মামলার জাল সাক্ষী সফদর মিয়াকে বরণ করে নেওয়া হল রাষ্ট্রপতির তদন্ত কমিটির প্রধানের পদে। (মুজিব হত্যার পর এই ব্যক্তিকেই উপহার দেওয়া হয় গোয়েন্দা শাখার প্রধান পদটি।) এমনি সব গুণধরে ভরে যায় পুলিশ শাখার আগা-পাশ-তলা। ফেরেব্বাজ, নপুংসক, শত্রুর স্যাঙাতরা মৃত্যুদণ্ডের বদলে পেয়ে গেল জানের ইজারা।

আর একদিক থেকে ছেঁকে ধরল পুরানো আমলাতন্ত্র। প্রশাসনের সবস্তরেই নাক ঢেকে বসে ছিল বাস্তুঘুঘুরা। এবার চাড়া দিয়ে উঠল। তাদের জালটি বেশ বিস্তৃত হল নানারকম শৃঙ্খলার নামে। মুজিবকে নির্ভরশীল হতে হল তাদের উপর। এবার তারা তৎপর হল শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র অফিসারদের তাড়াতে। অধ্যাপক কবির চৌধুরীর মত মানুষকেও তাই শিক্ষা-সচিবের পদ ছেড়ে দিতে হয়। সেখানে বসল একজন পিএসপি (পুলিশ) অফিসার।

পরিকল্পনা কমিশনও ওদের গাত্রদাহের কারণ। সেখানে রয়েছেন বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। তাদের বিরুদ্ধে দালাল পত্রিকাগুলির মাধ্যমে কুৎসা রটনা চলল প্রথমে। তারপর নানাভাবে তাদের বেইজ্জৎ করতে লাগল পদস্থ আমলারা। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান মান বাঁচাতে অক্সফোর্ডে চলে যান। অন্যরা ছেড়ে দেন কেউ বাধ্য হয়ে, কেউ বা ঘেন্নায়। আমলাতন্ত্রের ঘুঘুরা আসীন হল সেখানে। রাজনৈতিক আর প্রশাসনিক ক্ষমতার দুটি দণ্ডই তাদের হাতে গেল। সুতরাং তিয়াত্তরে আওয়ামী লীগের ধ্বস নামানো জয়ে তারা অস্বস্তি বোধ করবে, এটা স্বাভাবিক।

তারা অন্য কৌশল নিল। একাত্তরের পাক-যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তির জন্য চাপ দিতে থাকে। এদের সঙ্গে মার্কিনি চাপ হল দ্বিগুণ। মুজিব নতি স্বীকার করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, তেরহাজার যুদ্ধবন্দি এবং একশ' একানব্বই জন যুদ্ধাপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সঙ্গে কোনো পরামর্শ হল না। যাচাই করা হল না স্বাধীন দেশের জনমত। শোনা যায়, মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তাজউদ্দীন এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধাপরাধী একশ' একানব্বুইজনের বিরুদ্ধে একাত্তরের ব্যাপক নারী নির্যাতন ও গণহত্যার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ যখন রয়েছে, তাদের বিচার হোক, শাস্তি সাব্যস্ত হোক। তারপর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে বঙ্গবন্ধু ওদের ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন।

ভিন্ন যুক্তি দাঁড় করাল অপরপক্ষ। তারা বলে চলল– একটানা আঠারমাস কারাবাস করেছে যুদ্ধবন্দিরা, এই তো যথেষ্ট শাস্তি। এবার ওদের ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানে আটকে-পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা দরকার, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধীরা বেকসুর বেরিয়ে এল।

দুনিয়ার যুদ্ধাপরাধীদের এমন নিঃশর্ত মুক্তির নজির নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ও জাপানি যুদ্ধাপরাধীরা আজ পর্যন্ত কারান্ধকারে পচে মরছে। ইসরায়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ বছর পর আইকম্যানের বিচার করে ও মৃত্যুদণ্ড দেয়। কিন্তু বিচিত্র এই বাংলাদেশে অত্যাচারী গণঘাতকেরা নির্বিচারে ছাড়া পেল।

ক্রমে আমলা ও পাক-চক্রের দুর্নীতিতে ভরে গেল দেশ। মুজিব দিশেহারা। তাঁর নামেও কুৎসা রটাতে কসুর নেই। মুজিব কমনওয়েলথ কনফারেন্সে গেলেন বাইরের খানা তাঁর সহ্য হয় না বলে কিছু জ্যান্ত মাগুর টিনে করে গেল। তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা হল নানা কথা। মুজিবের মেজো ছেলে শেখ জামাল গেল স্যানডহারসট। রটল, লন্ডনে বিরাট বাড়ি কিনেছেন মুজিব। কোটি কোটি টাকা সেখানে সরানো হচ্ছে। যদিও মুজিব হত্যার পর সামরিক প্রশাসন দুনিয়া-ভর তল্লাশি চালিয়েও মুজিব পরিবারের সামান্য ক'লাখ টাকার বেশি কিছুর সন্ধান না পেয়ে তদন্ত বন্ধ করে দেয়।

দুর্নীতি আর দুষ্টচক্রের কারসাজিতে অভাব-অনটন দেখা দিল সবদিকে। শিল্পে উৎপাদন হ্রাস, বাণিজ্যে মন্দা, কৃষিতে অসাফল্য, অত্যাবশ্যক সামগ্রী নেই, নুন পর্যন্ত বাড়ন্ত। এই সংকটে প্রশাসনকে কড়া করতে থানায় থানায় পুলিশের পাশে মোতায়েন হল মিলিটারি। অর্থাৎ বাংলাদেশের নবজাত সামরিক শক্তি এই প্রথম শাসন-ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেল।

তবে বেশিদিন তার আস্বাদন হল না এ-যাত্রা। কুমিল্লায় এক গোলমালের ফলে থানাগুলি থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে ব্যারাকে ফেরত পাঠানো হল।

এ অবধি জুৎসই চাল চেলে গেলেন খোন্দকার। জিয়ার সঙ্গে যুক্তি করে তিনি সামরিক বাহিনীর তরুণ অফিসারদের কানে ফুঁ দিতে লাগলেন। কী? না, সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তায় মুজিবের গাত্রদাহ হচ্ছে। এ-জন্যই তাদের বেইজ্জত করে ব্যারাকে পাঠানো। সেই সুরে পোঁ ধরল একটি দালাল খবরের কাগজ। মুজিবের সঙ্গে সামরিক অফিসারদের ভুল বোঝাবুঝির সেই হল বীজ বপন। দেখতে দেখতে অঙ্কুর গজালো। কুমিল্লায় খোন্দকারের চামচারা এমন হৈ-চৈ জুড়ে দিল যার ফলে কয়েকজন তরুণ অফিসার সামরিক বিভাগ থেকে ইস্তফা দেয়।

এসব দেখে বিদেশের কয়েকটি রাষ্ট্র ক্রমে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা বদলাতে শুরু করে। তার উপর যুদ্ধাপরাধীদের নিঃশর্ত মুক্তি, শত্রুর সঙ্গে আঁতাতকারীদের প্রভাব বিস্তার, বিদেশমন্ত্রক থেকে আবদুস সামাদের অপসারণ প্রভৃতি ঘটনার পর তারা আর উৎসাহ পেল না বাংলাদেশের পাঁচসালা পরিকল্পনায় সাহায্য করতে।

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যচুক্তিও ভেস্তে গেল। নিউজপ্রিন্ট, পাট, ইলিশমাছ প্রভৃতি ভারতে না পাঠিয়ে নষ্ট করা হয় একটি চক্রের চেষ্টায়। প্রতিক্রিয়ায় ভারত বন্ধ করে কয়লা পাঠানো। চুয়াত্তরের শেষদিকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ওয়াই. বি. চবন তাঁর ঢাকা সফরকালে কথাটা সাফসোফ বলে ফেলেন, একদা বন্ধুর কাজ করলেই কেউ সব অবস্থাতেই চিরবন্ধুত্বের খৎ লিখে দিতে পারে না। দায়িত্ব দু'তরফেরই সমান, খোলামনে হাত বাড়াতে হবে।

আমেরিকা এবং সোভিয়েত দেশও নানা কারণে নিরুত্তাপ হয়ে পড়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে। আমলাতন্ত্রের কুচক্রীরা ওই সুযোগেই বাংলাদেশের বিদেশ দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দেয় মধ্য-প্রাচ্যের দিকে। তিয়াত্তরে মুজিব লাহোরে ইসলামিক সম্মেলনে হাজির হন। টিক্কা খাঁ স্যালুট ঠুকল, ভুট্টো জড়িয়ে ধরলেন বুকে। মুজিবও আবেগে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন ভুট্টোকে ঢাকা সফরের জন্য। ভুট্টো তো পা বাড়িয়েই ছিলেন। পাক গোয়েন্দা অফিসারদের একটি দলকে আগাম পাঠালেন। তারা এসে চকবাজার, কুর্মিটোলা, হীরাপুরে তাদের চরদের চাঙ্গা করে তুলল। এমন জাঁকালো সংবর্ধনার ব্যবস্থা হল ভুট্টোর যে, দুই-ভাইয়ের অপরূপ মিলনদৃশ্যে ভড়কে যায় বাইরের দুনিয়া। খোন্দকারগোষ্ঠী বহুৎ আচ্ছা বলে তালি বাজালো বেতমিজরা দেখুক।

৭

ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করা হল। এখন কেবল আমরা দু'জন। তাজউদ্দীন আর আমি। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, ব্যাপার কী! ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। কণ্ঠস্বর নিচে নামিয়ে তাজ বললেন, হ্যাঁ, হত্যা-ষড়যন্ত্র।

এটা উনিশ শ' পঁচাত্তরের এপ্রিলের এক সকালবেলা। আগের দিন ভারতের কৃষি ও সেচমন্ত্রী জগজীবন রাম ঢাকা সফরে আসেন। ফারাক্কা নিয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশের সঙ্গে। আলোচনা ও চুক্তির বিষয় নিয়ে আমরা কিছু ভারতীয় সাংবাদিক যখন সরকারি দফতরে খবর সংগ্রহের জন্য গেলাম, দেখলাম, আমরা ইতিমধ্যেই ওদের চক্ষুশূল হয়ে গেছি। কিছুকাল আগেও আমাদের সাদরে ডেকে কথা বলতো ওরা। হঠাৎ হাওয়া বদলে গেছে। দূর-পশ্চিমের কিছু বিদেশি সাংবাদিককে সাদরে বরণ করার জন্য যেন্ লাল কারপেট বিছানো। আর আমরা হয়ে পড়েছি অবাঞ্ছিত আগন্তুক।

পরদিন সকালেই গেলাম তাজউদ্দীনের কাছে। হাতে আমার বিদ্যাসাগর রচনাবলীর একটি খণ্ড। দুই খণ্ড আগেই তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনিই আমাকে বিদ্যাসাগর রচনাবলী সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এবার তৃতীয় খণ্ড নিয়ে গেলাম। আমাকে দেখেই তাজউদ্দীন বললেন, জরুরি কথা আছে, বসুন। সেখানে উপস্থিত অন্যদের চলে যেতে বললেন। বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে দরজা। তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হল। বলতে শুরু করলেন, গত চার-পাঁচ মাস আমি ঘর থেকে এক পা' বেরোইনি। একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছে।

আমি জানতে চাইলাম, কীরকম ধরনের ষড়যন্ত্র। তিনি বললেন, কী রকম? হত্যা! হত্যা-ষড়যন্ত্র! আমি শিউরে উঠি। প্রশ্ন করি– কারা এই ষড়যন্ত্র করছে? নাম জানতে পারি? তাজউদ্দীন গম্ভীরভাবে বললেন, কী হবে আর নাম শুনে! তারা সব শেখ সাহেবের বিশ্বস্ত লোক।

– শেখ সাহেব তা জানেন?

– জানার তো কথা।

তাজ গোড়া থেকে ব্যাপারটা বলতে থাকেন। ক'দিন আগে, এক রাত্রে মেজর জেনারেল জিয়া দেখা করতে আসে। সে প্রস্তাব দিল, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মুজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। তারপরে তাঁকে আটক রাখা হবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। এ ব্যাপারে সে তাজউদ্দীনের সমর্থন চায়। তাজউদ্দীন তাকে সাফ বলে দেন, এর মধ্যে আমি নেই। এরকম জঘন্য ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না।

তাজউদ্দীন বললেন, নিজের থেকে যে জিয়া আসেনি আমার কাছে, তা তা বেশ বুঝতে পারলাম। ওকে পাঠানো হয়েছিল, এরকম একটা প্রস্তাবে আমার কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বুঝতে। আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই জিয়ার কথাটা জানিয়ে দেই মুজিবকে।

– মুজিব কী বললেন?

তাজের উত্তর : আমি বুঝতে পারলাম না, মুজিব আমাকে বিশ্বাস করলেন কিনা। যা হোক, আমি কিছুদিনের জন্য অন্তত রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চাই। আমার এক ভাই পাশের ঘরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তা নিয়েও আমাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তাছাড়া দেশের যা পরিস্থিতি এখন তা অত্যন্ত দূষিত। ভারত-বিরোধী মনোভাব চরমে পৌঁছেছে। যে সাম্প্রদায়িক মুসুল্লিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি জুন্টার লেজুড়বৃত্তি করেছে, তারাই আজ প্রশাসনের মাথায় চড়ে বসছে। এই অবস্থায় ভারত সরকার আর ভারতের জনগণের সামনে আমি কোনমুখে দাঁড়াব? আপনি জানেন, আমাদের সেই সংগ্রামের দিনে আপনাদের সরকার আর জনগণ কী না করেছে আমাদের জন্য। আজ সেই পরমবন্ধু ভারতের বিরুদ্ধেই কদর্য মিথ্যে প্রচার চালানো হচ্ছে। এ সবের পিছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে, আমি জানি। তাই আমি দূরে সরে থাকতে চাই।

– তা তো থাকলেন, কিন্তু আপনি যে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

তাজউদ্দীন বললেন, হ্যাঁ সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র, আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব এতে।

– মানে?

– মানে আমাদের সবাইকে খতম করার পরিকল্পনা প্রস্তুত।

– সে কি! আপনাদের কিছু করবার নেই ষড়যন্ত্র বানচাল করতে? কিছু করুন একটা।

করব? তাজউদ্দীনের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তিনি আমার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি রেখে বললেন, 'আপনাকে এ-সব বলছি, কারণ আমি জানি, আপনি

আমার বন্ধু। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, কলকাতায় গিয়ে গোলক মজুমদারকে ব্যাপারটা বলবেন দয়া করে।' গোলক মজুমদার তখন ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনীর আই.জি। উনিশ শ' একাত্তরে তাজউদ্দীন যখন বাংলাদেশ থেকে কলকাতার উদ্দেশে আসতে চেষ্টা করছিলেন, তখন ভারতের সীমান্তরক্ষীবাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান তাঁকে সীমান্ত থেকে সাদরে সসম্মানে গ্রহণ করেন। তাঁকে সীমান্তরক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে এঁদের সঙ্গে তাজউদ্দীনের এবং স্বাধীন সরকারের এক ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

আমি তাজউদ্দীনকে কথা দিলাম, তাঁর বার্তা যথাস্থানে পৌঁছে দেবো। এবার তাজউদ্দীনকে গোড়া থেকে ষড়যন্ত্রটা আমায় বলে গেলেন : ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরের পর থেকেই খোন্দকারের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের চার-পাঁচজন শয়তান মুজিব সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করে আসছে। এবং বাইরের শক্তিবিশেষের সাহায্যও পাচ্ছে তারা এতে। বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার হালে জেদ্দা গিয়েছিলেন। এক পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলও ঠিক ওই সময় সেখানে ছিল। সেখানে বসেই ষড়যন্ত্রের সব ছক পাকা হয়ে যায়। সেখান থেকে ফিরবার পর খোন্দকার গোপনে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ভসটারের সঙ্গে ঘন ঘন মিলিত হন। তাঁদের মিলন হয় মানিক মিয়ার বাড়িতে। মানিক মিয়া বেঁচে থাকলে তার বাড়িতে এ-ব্যাপারে কিছুই হতে পারত না।

আমি অর্থ দফতর ছেড়ে দিলাম। এর পরই মার্কিন দূতাবাস ব্যাঙ্ক থেকে একদিনেই তিনকোটি টাকা তুলে নেয়। ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে অর্থও এসে গেল অঢেল।

তাজউদ্দীনের এ-কথায় আমার কৌতুহল আরো বাড়ে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি : কিন্তু আমেরিকার কী স্বার্থ থাকতে পারে এতে?

'অনেক স্বার্থ'– তাজ জবাব দিলেন। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো যখন বাংলাদেশে গণহত্যা চালাচ্ছিল, তখন একমাত্র আমেরিকাই ওদের সমর্থন করে। এখন তারা তাদের সেই সমর্থনের পিছনকার আসল উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করতে চায়। তাই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অপরদিকে ইসলামিক দেশগুলি, বিশেষ করে সৌদি আরব, জর্ডান, লিবিয়া কোনোক্রমেই 'ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে মানতে পারছে না। বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র করার জন্য পরোক্ষভাবে তারা চাপ দিয়ে চলেছে। তা হলে তারা নানা সাহায্য দেবে বলে লোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু উনিশ শ' সত্তরে এবং তিয়াত্তরে আমরা যে নির্বাচনে লড়ে বিজয়ী হই, তাতে আমরা

ধর্মনিরপেক্ষতাকেই আদর্শ-রূপে ঘোষণা করি। আজ সে-নীতি বর্জনের কথা কিছুতেই উঠতে পারে না। অথচ ওরা সেইটেই চায়। অপরদিকে খোন্দকার চক্র। এই খোন্দকার কখনো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ চাননি। সর্বদা তিনি পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

তাজ বলে চলেন : পাক-সৈন্য কেন অমন করে আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জানেন? তার কারণটাও বলছি। আমরা আওয়ামী লীগের পঞ্চপ্রধান একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। পাকিস্তানের মধ্যেই নির্বাচনে আমরা ক্ষমতা দখল করতে পারব জানতাম। প্রথম তাই করব। শেখ সাহেব মন্ত্রিসভায় থাকতে চাইবেন না। সৈয়দ নজরুল হবেন প্রধানমন্ত্রী, আমাকে করা হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। খোন্দকারকে পার্লামেন্টের স্পীকার করে দেব। তারপর এক সময় প্রধানমন্ত্রীরূপে সৈয়দ নজরুল হুকুম করবেন– পূর্ব পাকিস্ত ান থেকে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী সরিয়ে আনো।

আমি সে-হুকুম তামিল করব। এই কাজটি যেই হয়ে যাবে, তখনই জাতির পিতা হিসেবে মুজিব ঢাকায় জাতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকবেন। সেখানে তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রস্তাব তুলবেন। সে প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেবে সার্বভৌম বাংলাদেশ। ভুট্টো এই পরিকল্পনার আভাস পেয়ে যান। খোন্দকারই ফাঁসিয়ে দেন এটা। আর সেই জন্যই পঁচিশ মার্চ পাকসৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপরে।

তাজ বললেন : মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রত্যেকটি পরিকল্পনা সাবোতাজ করার চেষ্টা করে খোন্দকারচক্র। আর দুর্ভাগ্যের কথা, সেই চেষ্টায় মুজিব-পরিবারের সাহায্যও পায়।

– এ-সব কথা মুজিবকে বলেননি কেন? আমি প্রশ্ন করি।

তাজউদ্দীন বললেন, তিনি শুনতেই চান না।

– আবার চেষ্টা করে দেখুন না। আমি উদ্বিগ্নভাবে বলি।

তাজ বললেন : আমি চাই না যে মুজিব আর আমার মধ্যে কোনোরকম ভুল বোঝাবুঝি এবং তিক্ততার সৃষ্টি হোক। বস্তুত মাত্র ক'দিন আগে মুজিব আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে ডাকেন। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কিছু কথা আছে। আমি তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছি, বঙ্গবন্ধু আমি জানি আপনি আমায় ভালোবাসেন। কিন্তু আপনার পরিবারের লোক আমায় পছন্দ করে না। এই অবস্থায় আপনার ওখানে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। আপনিই পারিবারিক অশান্তিতে পড়বেন। আমি তা চাই না। শেখ সাহেব তখন একটু

কী ভেবে ওই ফোনেই আমাকে বললেন, তুমি অন্তত 'বাকশাল'-এর ভার নাও, আমি চাই তুমি সাধারণ সম্পাদক হও।

তাজ বললেন, আমি তাতেও রাজি হই নি। আমি বঙ্গবন্ধুকে আদাব জানিয়ে বলি : আমি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে মাফ করবেন।

একটু থামলেন তাজউদ্দীন। তারপর বললেন : আসলে একদিকে যেমন সি.আই.এ তাদের ডলারের থলে নিয়ে দালাল কিনতে নেমেছে, আর একদিকে তেমনি আসরে নেমে পড়েছে রুশচক্র। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি আর 'ন্যাপ' (মুজফফর) তো রুশ রুবল পাচ্ছেই ঢাকার রুশ দূতাবাসের মারফৎ, এমনকি মুজিবের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের একটি পত্রিকাকেও অর্থ যুগিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। ভারত ছাড়া পৃথিবীর বৃহৎ শক্তির এগারটিই চাইছে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম বানাতে। এবং তাদের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছে এই দেশ। তাই আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি।

বারবার তাজ বলতে লাগলেন : সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সার্বভৌম, স্বাধীন বাংলাদেশের যারা রূপকার তারা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি বিচলিত বোধ করি। বুঝতে পারছি না এরকম একটা পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। জিজ্ঞেস করলাম, ভারত সরকার কি জানে ব্যাপারটা?

তাজ বললেন : জানা উচিত। ভারতের হাইকমিশনের অফিসাররা নিশ্চয়ই চোখ-কান বুজে নেই।

আমি আর একটা জিনিস পরিষ্কার হতে চাই : বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা মানে মার্কিন কূটনীতির পরাজয়। এজন্য তারা প্রতিশোধ নিতে চাইতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার কী স্বার্থ আছে এতে?

তাজ বললেন : এটা নেহাৎ ওদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দু' দেশেরই গুপ্তচক্র বাংলাদেশে তৎপর রয়েছে। আর আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের যে-কোনোভাবে কেনা যায়। তাদের বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম নেই। না হলে যে-মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের ভাইবোনদের নির্বিচারে হত্যা করেছে সেই মার্কিন দূতাবাসে 'ককটেল' করতে যেতে পারতো না ওই লোকগুলি।

ওরা ইসলামের ধার ধারে না, অথচ সর্বদা ইসলাম, ইসলাম বলে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলছে।

তাজউদ্দীন বললেন : ঢাকার ইন্টার কন্টিন্যান্টাল-এ বেশ কয়েক মাস আমি গুরভানভ নামে এক রুশ নাগরিককে দেখেছি। লোকটি প্রায় আসত। বাংলা বলত অনর্গল। পরে শুনলাম, সে রুশ গোয়েন্দাচক্র কে.জি.বি-র এক

উচ্চপদস্থ অফিসার। এই উপমহাদেশের গুপ্তচরজালের দেখা-শোনার দায়িত্ব তার। আমাদের রুশপন্থী নেতারা তাকে খুব খাতির করেন দেখি। দেশের লোকই যদি বিদেশি গোয়েন্দা চক্রের দালালি করে, তাহলে মুজিব কী করতে পারে বলুন।

তাজউদ্দীনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আমি গেলাম এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানের বাড়ি। আমাকে দেখেই বললেন– জর্দা কই? এই একটি বিলাসিতা কামরুজ্জামানের, ভালো পানটি চাই। আর চাই তার সঙ্গে ভালো জর্দা। আমি যখনই ঢাকা যেতাম, ওঁর জন্য জর্দা নিয়ে যেতাম এক কৌটা। এবারও এনেছি। কিন্তু সঙ্গে নেই। হেসে আশ্বস্ত করলাম : হোটেলে রয়েছে আপনার জর্দা। পাবেন। তারপরে শুরু করি আমার আসল কথা। এসব কী শুনছি! কামরুজ্জামান বললেন : আগে বলুন কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার, কী পেলেন শুনি।

আমি বললাম, আপনিই বলুন না, কী হাল এখানকার।

– খুব খারাপ। কামরুজ্জমানের মুখে বিষণ্ণ হাসি।

আমি প্রশ্ন করি– খারাপটা কী বলুন না।

তিনি বললেন : খোন্দকার এক দারুণ ষড়যন্ত্র করেছে। এর বেশি বলবো না। বাকিটা আপনি চেষ্টা করলেই জানতে পারবেন। শিগগিরই কলকাতা যাচ্ছি। সুযোগ হলে সেখানে হয়তো সব বলতে পারব।

রাতে জাহানার ইসলামের এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে এক পার্টিতে গেলাম আমন্ত্রিত হয়ে। সেখানে দেখা হল বেশ কিছু আর্মি অফিসারের সঙ্গে। এদের মধ্যে মেজর ডালিমও ছিলেন। আর ছিলেন বাংলাদেশ তথ্য দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল এম. আর. আখতার, বি.বি.সি-র সংবাদদাতা শ্যামল লোধ প্রমুখ। মুজিব সরকারের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উঠল। সেখানে মেজর ডালিম স্পষ্ট বলেন : মুজিবের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে একমাত্র উপায় সামরিক শাসন কায়েম করা।

ঢাকায় তখন ভারতবিরোধী হাওয়া চলছে প্রবলভাবে। আমি বেশি মুখ খুললাম না। বস্তুত আখতারই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে চুপ করে থাকতে পরামর্শ দেন। আলোচনার ধারাটাও তিনি ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হন।

হোটেলে ফেরার পথে আখতার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বুঝতে পারলেন আজ?

শুধু বললাম– কী আর বুঝবার আছে।

পরদিন সকালে গেলাম আবদুল গাফ্‌আর চৌধুরীর কাছে। এই সেই বিখ্যাত সাংবাদিক, নির্ভীক লেখনীর জন্য আয়ুব শাহী যাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল। প্রথমে গাফ্‌ফার সাহেব আমাকে বললেন, কী আর বলবো, আমি তো বাইরে চলে যাচ্ছি স্ত্রীকে নিয়ে।

– কেন?

স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। তার ভালো চিকিৎসার জন্যই বাইরে যেতে হচ্ছে। এ-ব্যাপারে শেখ সাহেব আমাকে সাহায্য করছেন।

এ পর্যন্ত এক রকম বললেন। তার পরই গাফ্‌ফার সাহেব পাড়লেন আসল কথাটা : বোধহয় চিরদিনের মত ঢাকা থেকে বিদায় নিচ্ছি।

– মানে? আমি আরও স্পষ্ট উত্তর চাই।

তিনি বললেন, মানে, আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। একটি পশ্চিমি দূতাবাস এখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। আর তাতে মদদ দিচ্ছে মুজিবেরই এক ঘনিষ্ঠ মহল। ক'দিন আগে একটি খবরের কাগজের জনৈক সম্পাদকের বাড়িতে এক ডিনার ছিল। সেই নৈশভোজের টেবিলে মেজর জেনারেল জিয়া খোলাখুলিভাবে বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের পক্ষে বলে যাচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ভস্টার তিনি জিয়াকে সমর্থন করতে থাকেন। সে ভোজসভায় উপস্থিত কারো বুঝতেই আর বাকি রইলো না যে সত্যিই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

বন্ধুদের অনুরোধে পরে গেলাম বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকারের সঙ্গে কথা বলতে। আমায় তিনি জড়িয়ে ধরলেন : কলকাতার খবর কি বলুন।

একাত্তর সালে কলকাতায় প্রায় দশমাস খোন্দকার আমার বাসার কাছাকাছি ছিলেন। প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে আমাদের দেখা-সাক্ষাত হতো। সব সময় তাঁর একটা অভিযোগ শুনতাম, কলকাতার কাগজগুলি তাজউদ্দীন আর নজরুলের কথাই প্রচার করছে বেশি করে। তাঁর কথা তেমন লেখা হচ্ছে না। তখন তিনি ছিলেন স্বাধীন সরকারের বিদেশমন্ত্রী। সুতরাং খোন্দকারের কথা, তাঁরই তো এখানে বেশি গুরুত্ব। অথচ তা হতো না দেখে প্রায়ই তিনি তাঁর এক চেলা আমিরুল হক বাদশাকে পাঠাতেন খবরের কাগজের অফিসে খোন্দকারের নানা বিবৃতি নিয়ে। বাদশা একদিন আনন্দবাজার অফিসে এসে আমায় বলেছিলেন, মোস্তাক সাহেব নেতা বঙ্গবন্ধুর আসল লোক। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বেশি বিশ্বাস করেন। আপনারা তাঁকে একটু তুলুন। স্বাধীন হওয়ার পর বাদশা শেখ মুজিবের সহকারী প্রচার-সচিব নিযুক্ত হয়। '৭৪ সালে শেখ সাহেব বাদশাকে ছাঁটাই করেন।

এদিন তিনি আমাকে বললেন, বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি চান, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের আরো উন্নতি হোক। এই তো কলকাতাকে মাছ দেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হল না। মুজিবই পিছিয়ে দিলেন।

একজন বাইরের সাংবাদিকের কাছে এভাবে মুজিবের বিরুদ্ধে কী করে বলতে পারলেন তিনি আমি তা বুঝলাম না। বাংলাদেশের সবাই জানে, মুজিব-তাজউদ্দীনের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছেন এই খোন্দকার। মুজিবের স্ত্রী, পুত্র ও ভাগ্নের সাহায্যে।

আমি কলকাতায় ফিরে এসেই গোলক মজুমদারকে সবকথা জানালাম। তারপরে দুটো বড়ো লেখা দিলাম আমাদের পত্রিকায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি বর্ণনা করে। লেখা দুটি পড়েই ঢাকা থেকে দু'জন মন্ত্রী আমাকে ট্রাঙ্ককল করে অভিনন্দন জানান। তাঁরা হয়তো আশা করেছিলেন, এবার সবার টনক নড়বে। একটা ব্যবস্থা হবে দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে। ওঁরা বাঁচবেন। হায়, তা হল না।

আমার সঙ্গে কথা বলার পর গোলক মজুমদার ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অশ্বিনী কুমারকে এক গোপন রিপোর্টে সব জানালেন। সে রিপোর্টের কপি আমি দেখেছি। তাতে বাংলাদেশে যে একটা বিশ্রীকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে সে কথা বলা ছিল। বলা ছিল সেখানকার ফৌজি-তৎপরতা বৃদ্ধির কথাও।

গোলক মজুমদারের রিপোর্ট দিল্লি পৌঁছানোর ক'দিনের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ সচিব রুস্তমজী কলকাতায় হাজির হলেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি জানতে চান, তাজউদ্দীন ঢাকায় আমাকে কী বলেছে। আমি তাঁকে সবকথা খুলে বললাম। রুস্তমজী সব শুনে দিল্লি চলে গেলেন। আমি ভাবছি কিছু একটা হবে। ইতোমধ্যে ভারতের উপর নেমে এলো ইমার্জেন্সির যবনিকা। এতে আরো অনেক কিছুর মতো বাংলাদেশ সম্বন্ধেও কিছু লেখা নিষিদ্ধ হল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দিল্লির সেন্সর বোর্ডকে বোঝালেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু লিখলে তাঁর মন্ত্রিসভায় যে পাঁচজন মুসলমান সদস্য রয়েছেন তাঁরা নাকি অসন্তুষ্ট হবেন। ফলে বিদেশ মন্ত্রকের বাংলাদেশ সম্পর্কিত যুগ্মসচিব সি. আজমানি খবরের কাগজের ওপর এক নোটিশ জারি করে দিলেন যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো কথা ছাপা চলবে না।

এর যথার্থ কারণটা দুর্বোধ্য। এমনকি ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং সরকারি মুখপাত্র এ. এন. ডি. হাকসার পর্যন্ত আমাদের সামনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কেন এমন নিষেধাজ্ঞা হল।

খবর ছাপাই যখন যাবে না, সাংবাদিক হিসেবে আমাদেরও সংবাদ সংগ্রহে উৎসাহ কমে গেল। বাংলাদেশের ব্যাপারে একরকম 'প্রেস ব্লাকআউট' হল। আর সেই ব্লাকআউটের অন্ধকারই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কাজে লাগল কুচক্রীদের।

৮

জেলাগুলি আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক-একজন গভর্নরের প্রশাসনিক অধিকারে চলে যাচ্ছে। সব ব্যবস্থা পাকা। চক্রান্তকারীরা ভেবে দেখল, আর দেরি করা ঠিক নয়। এরপর প্রশাসন হয়ে পড়বে বিকেন্দ্রীভূত। তখন মুজিব এবং তাঁর সরকারকে কোনো একটা বিশেষ পয়েন্টে ধাক্কা দিয়ে কিছু করা যাবে না। করতে হয় তো—মুহূর্তেই শেষ করো। সিদ্ধান্ত পাকা, সেপ্টেম্বরের আগেই মুজিবকে খতম করো, ক্ষমতা দখল করবে সেনাবাহিনী, ব্যস, কাম ফতে। শয়তানেরা ক্রুর হাসি হাসলো।

উনিশ শ' পঁচাত্তরের পনের আগস্ট। রাতের ঘুম ভেঙে ঢাকা শহর তখনো পুরো জেগে ওঠেনি। কিন্তু ঘুম নেই ঘাতকের চোখে। ভোরের প্রশান্তি ছিন্নভিন্ন করে মুহুর্মূহু বন্দুকের আওয়াজে কেঁপে উঠল শহরটা। সবাই হতচকিত, কী হল? আমার টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফোন ধরতেই কলকাতায় বিদেশ দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ ভেসে এলো : শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাচ্ছে।

কিন্তু কী ঘটতে পারে, আমি তো বুঝছি না। সে বলল : বুঝে উঠতে পারছি না আমিও। তবে ঢাকার উপর কারফিউর যবনিকা নেমেছে। রেডিওটা খুলে দিন। দেখুন কিছু পান কিনা। আর কিছু পেলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।

আমি আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে রেডিওর ঢাকা সেন্টার ধরলাম।

একটা অস্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে আসছে। কে বলছে? কী বলছে? ক্রমে স্পষ্ট হল। মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে : মুজিব সরকারের পতন হয়েছে। সেনাবাহিনী দখল করেছে ক্ষমতা। বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ নেই। এখন থেকে তার পরিচয়— 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।' এর পরই অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ ঘোষিত হল।

আমি হতভম্ব। তাহলে, মুজিব? সে কি নিহত! ষড়যন্ত্রের কথাটা তাহলে গুজব নয়, সাংঘাতিক ভাবে সত্য!

সকাল সাতটার মধ্যেই পাকা খবর পাওয়া গেল। খারাপ খবর মিথ্যে হয় না। মুজিব এবং তাঁর পরিবারের সকলকে জল্লাদরা ধানমণ্ডির বাড়িতে হানা দিয়ে একের পর এক হত্যা করেছে! এখনও ঘরের মধ্যে পড়ে আছে রক্তাপ্লুত মৃতদেহগুলি। আর সেই সময়, অন্য কেউ নয়, সেই খোন্দকারকে দেখা গেল দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন ক্ষমতার মসনদে বসতে। মুজিব সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী, নেতৃত্বের চতুর্থতম ব্যক্তি আজ নিরঙ্কুশ করলেন প্রথম স্থানটি। মুক্তিযুদ্ধের দিন থেকে যে ষড়যন্ত্রটি তিনি সতর্কতার সঙ্গে করে যাচ্ছিলেন আজ তা সফল!

দু'শ' আঠারো বছর পর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। এমনি বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস পলাশীর। সেও এক বাইরের শক্তি চক্রান্ত করে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করে দালাল মীর জাফরকে মসনদে বসায়। আজও এক বিদেশি শক্তি খোন্দকারের মাধ্যমে তাদের পুতুল সরকার কায়েম করল বঙ্গবন্ধুকে শেষ করে।

খোন্দকার যখন শপথ নিচ্ছেন, তখনো সপরিবার বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত মৃতদেহ বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডিতে পড়ে আছে। আর ক'জন কাপুরুষ বেয়নেট-তাড়িত হয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছেন মন্ত্রী হতে। ওদের লাইনে সামিল করা গেল না মুজিব মন্ত্রিসভার কেবল সৈয়দ নজরুল, মনসুর আর কামরুজ্জমান– এই তিনজনকে। খোন্দকার ওই ত্রয়ীকে তক্ষুণি গ্রেফতার করার হুকুম দিলেন। সেই সঙ্গে আরও দুজন তাজউদ্দীন আর আবদুস সামাদকেও গ্রেপ্তার করতে বলা হল। মুজিব পরিবার নিশ্চিহ্ন; তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না যতদিন ওই পাঁচজন বাংলাদেশে থাকে। খোন্দকার সব কাঁটা তুলে ফেলতে চান। এতদিনের খোয়াব আজ সফল হতে চলেছে। জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণ দিলেন তিনি। তাতে জয়ধ্বনি দিলেন মুজিব হত্যাকারী মেজরদের। বললেন, ওরাই নয়া জামানা পয়দা করল– ওরা 'সূর্য সন্তান!'

এই ভাবেই মুজিব এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যার মধ্য দিয়ে নবজাত এক স্বাধীন দেশকে আবার দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা হল– এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত কলকাতায় বসে, উনিশ শ' একাত্তরে। এর সঙ্গে সেদিন যারা যুক্ত ছিল– তাদের অন্যতম মেজর, পরবর্তীকালের মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। নয়জন সেক্টর কমান্ডারের মধ্যে একমাত্র এই লোকটিই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে।

গোড়াতেই একটা জিনিস ধরা পড়ে। যখন আখাউড়া রণাঙ্গনে মেজর জলিল, খুলনা-সুন্দরবন সেক্টরে মেজর ওসমান, অন্য সেক্টরগুলিতে মেজর

হুদা প্রমুখ পাকিস্তানি দখলদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রাণপর লড়াই করে যাচ্ছিল, তখন শাবরুম সেক্টরে জিয়া ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয়।

সেই একাত্তরের একটি বিশেষ ঘটনার কথা তাহলে তুলতে হয়। পঁচিশ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্য যেদিন বাংলাদেশের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মেজর জিয়াউর রহমান তখন চট্টগ্রামে। পরদিন বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য নিয়ে জিয়া বন্দর এলাকায় চলল। কিন্তু 'টাইগার পাশ' ছাড়িয়ে আর এগোনো সম্ভব হল না তার। ক্যাম্পে ফিরে এল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রেডিওর চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কিছু কর্মী ও আওয়ামী লীগের তরুণেরা চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশনটির দখল নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের কথা রেডিও মাধ্যমে বিশ্বের কাছে জানিয়ে দেওয়ার জন্য একজন নায়ক তারা খুঁজছিল। জানতে পারলো, কাছাকাছিই বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছাউনিতে একজন বাঙালি মেজর রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা জিয়ার কাছে এলো। কিন্তু এক কথায় রাজি হওয়ার লোক সে নয়। অনেক বোঝানো হল। তরুণরা তাকে বলল– মরতে আপনাকেও হবে। তবে কেন মৃত্যুবরণে ভয় পাচ্ছেন? আপনি না বাঙালি সেনানায়ক? একবার কেবল বলুন– বাংলাদেশ স্বাধীন। জিয়া নিমরাজি হল। বেতারকেন্দ্রের পিছনেই তার সামরিক ছাউনি। চট্টগ্রামের চারদিকে তখন দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। মুহুর্মুহু গোলাগুলির আওয়াজ। মেজর জিয়া সেই পরিবেশে বাঙালি তরুণদের সঙ্গে এসে মাইক্রোফোনের সামনে বসলেন। কয়েকবার গলা খেঁকড়ে সাফ করে নিলেন। তারপর তার ঘোষণা। কিন্তু কী বলছে জিয়া? সে বলছে, স্বাধীন বাংলাদেশের সে-ই প্রধান।

তরুণেরা থামিয়ে দিল তাকে। মুজিবের কথা বলুন। বলুন তিনিই প্রধান। তখন সে বলল : শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তাঁরই নির্দেশে আমি এই কথা ঘোষণা করছি।

স্বাধীনতার পর এ ব্যাপারে ঢাকায় নানা কথা শুনেছি। একদিন সাহস করে শেখ মুজিবকে জিজ্ঞাসা করলাম। শেখ সাহেব আমায় বললেন : আমি আওয়ামী লীগ নেতা এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের ৭ই মার্চের পর থেকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম, যদি হঠাৎ ইয়াহিয়া খাঁ আমাকে জেলে নেয়, তবে তোমরা যে-কোনোভাবে একটা রেডিও স্টেশন দখল করে আমার নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করবা। এটাই ছিল আমার লোকের প্রতি আমার গোপন হুকুম।

কয়েকদিন পর চট্টগ্রামের উপরে থার্ড কমান্ড ব্যাটালিয়নের দুটি ব্রিগেড পাক নৌবহর এবং বিমানবাহিনীর যুগপৎ আক্রমণ শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধরাও

পাল্টা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। সংবাদ সংগ্রহ এবং রিলিফের কাজে অনেক বিদেশি সেখানে ভিড় করে। মনে হয়, ওই সময়ই বিশেষ বিদেশিচক্র জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা ধরে নেয় স্বাধীনতা ঘোষণাকারী ওই লোকটি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। একে কাজ লাগাতে হবে। পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রমাণ হয়, হিসেবে তারা ভুল করেনি।

স্বাধীনতার পর মুজিব কিন্তু কমান্ডারদের কাউকে জেনারেল পদে উন্নীত করতে চান নি। তবে চক্রান্তকারীদের প্রবল চাপের কাছে তাঁর অনেক ইচ্ছাই টেকেনি।

খোন্দকারগোষ্ঠী যখন বুঝতে পারলো, প্রাক-স্বাধীনতার সময় তাদের মুজিবনগর ষড়যন্ত্রের কথা স্বাধীনতার পরবর্তী আবেগে সবাই ভুলে আছে, কাউকে দাঁড়াতে হল না বিচারের কাঠগড়ায়, তখন নিশ্চিন্তে তারা নতুন উদ্যমে জালবিস্তার করতে লাগল। আরও অনেক ধান্দাবাজ ভিড়তে লাগল ওদের গোঠে। এল ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, খোন্দকার আবদুল হামিদ, আশফাদুল্লা রেজা প্রমুখ। ইত্তেফাক জিগির তুলল– বিপ্লব নয়, সংসদীয় গণতন্ত্র না, বাঙালি জাতীয়তাবাদও চাই না। চাই বাঙালি মুসলমানি জাতীয়তাবাদ। অভিযান প্রেস, মইনুল হোসেনের বাড়ি এবং ধানমণ্ডির আরও কোনো কোনো ডেরায় মিলিত হতে লাগলো কুচক্রীরা। কৌশল স্থির হল। প্রথমত পাকিস্তানিদের সঙ্গে যারা হাত মিলিয়েছিল তাদের ছাড়িয়ে আনতে হবে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। তাতে চুপসে যাবে মুক্তিফৌজের গরিমা। তারপরে বাধা দিতে হবে যে-কোনো প্রগতিশীল বৈপ্লবিক কার্যসূচীতে, সরকার এতে জনপ্রিয়তা হারাবে। আর চালাতে হবে ইসলামের নামে সাম্প্রদায়িক প্রচার অভিযান। ঢাকার একটি দৈনিকের উপর ন্যস্ত হল এই ভার। দৈনিকটির সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যে কতো হীনভাবে ওই কাজ চালিয়েছে তার মুদ্রিত প্রমাণ সব আজও রয়েছে। তার যোগ ছিল একটি বিদেশি দূতাবাসের সঙ্গে। এই ব্যক্তির জন্যই মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর পরিবার পাক ফৌজকে এড়িয়ে পালাতে পারেনি। বলা বাহুল্য, সে লোককেও মুজিব ক্ষমা করেন।

ওই গোষ্ঠীর উসকানিতে ধীরে ধীরে মুজিববিরোধী সমালোচনা প্রকাশ্যে হতে শুরু করে। সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়া কিছু অফিসার তাদের সঙ্গে যোগ দিল প্রতিশোধ নিতে। প্রকাশ্য সভা হতে লাগল ঢাকাতে, কুমিল্লায়। মুজিবের কাছ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত দক্ষিণপন্থী নেতারাও সুযোগ বুঝে হাত মিলালো ওদের সঙ্গে। শিল্পপতিরাও পিছনে এসে দাঁড়াল। কুচক্রীরা

অল্পদিনের মধ্যেই ঢাকা-লন্ডন রাওয়ালপিন্ডি যোগাযোগ লাইন করে নিল। লন্ডন-জেদ্দা এবং লন্ডন-করাচির মধ্যে ঘনঘন ছোটাছুটি চলতে থাকে, বৈঠক বসতে থাকে শলা-পরামর্শের। লন্ডনে বেশ কয়েকটা বৈঠকের পর পাকিস্তানিরা কথা দেয়, ঢাকার কুচক্রীদের সব রকম মদদ মিলবে। স্থির হল, মুজিবকে 'ক্ষুদে ডিক্টেটর' রূপে দেখিয়ে লন্ডনের খবরের কাগজগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে পনের আগস্ট। মুজিবের হত্যা ও ওইরকম বিজ্ঞাপন একই সময় করার পরিকল্পনা হয় এজন্য যে তাতে বাইরের বাঙালিদের বেশ বিভ্রান্ত করা যাবে। লন্ডনে বাংলাদেশের এক সাংবাদিকের মুখে শুনেছি মুজিব-হত্যার যে পরিকল্পনাটা, গোড়ার দিকে তার জন্য অন্য একটা সময় বেছে নেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল, চট্টগ্রামের বেতবুনিয়াতে মুজিব যেদিন উপগ্রহ উৎক্ষেপন কেন্দ্রের-উদ্বোধনে যাবেন তখনই কাজ ফতে করা হবে। কিন্তু ওই সময় সেখানে ট্যাঙ্ক ডিভিশনকে হাজির রাখা সম্ভব নয় বলে পরে স্থান-কাল বদল করা হয়। চক্রীদের এই সময় নির্বাচনের দিকটাও অসাধারণ।

নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান তখন বাইরে। সামরিক গোয়েন্দা শাখার নতুন ডিরেক্টররূপে কর্নেল জামিল তখনও দায়িত্ব নেননি। এমন কি ভারতীয় হাই কমিশনার এবং রুশ রাষ্ট্রদূত-দু'জনের কেউই তখন ঢাকায় নেই। আর এদিকে, বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলিও ক্রমে মুজিব সম্পর্কে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগের একটা অংশ বিরূপ হয়ে উঠেছে বাকশাল পোলিটব্যুরো যে-ভাবে গঠিত হয়েছে তা দেখে। মতাদর্শের বিরোধে জাতীয়তাবাদী শক্তি তখন নানা ধারায় বিভক্ত, বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত। এমনি একটা দুঃসময়– শয়তানের সুবর্ণ সুযোগ।

মুজিবকে সরানোর একটা ষড়যন্ত্র যে হচ্ছে এটা সব গোষ্ঠীই জানতো। কিন্তু কেউই ধারণা করতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত জিয়াকে দিয়েই পুতুল সরকার বসানো হবে বাংলাদেশে। খোন্দকার, জেনারেল ওসমানী, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল তাহের, এয়ার ভাইস-মার্শাল তোয়াব এবং অন্য যে-সব মেজর মুজিব-হত্যার সঙ্গে যুক্ত সেই সব 'কাজী'রা যে কাজ ফুরোলেই পাজী' হয়ে পড়বে, ভাবতে পারেনি আগে। তথাকথিত 'নেতারা সব ছেঁড়া ন্যাতার মত নিক্ষিপ্ত হল আঁস্তাকুড়ে। কুরশিপর আসীন হল জিয়া। চক্রীদের সরিয়ে দেওয়ার লোকচক্ষুর সামনে একটা চমৎকার ভাবমূর্তি খোলতাইও হল তার।

অন্ধকারের ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে পড়ে। ওই সময়কার তথ্য ও বেতার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুরই ছিল চক্রের বিভিন্ন ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগকারী। খোন্দকারের নির্দেশমত সে জেনারেল জিয়া

থেকে সব কজন পান্ডাকে 'চরম মুহূর্তের' সংকেত দিয়ে চলে। 'ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাতে বলা হয়, উনিশ শ' পঁচাত্তরের সাত আগস্ট প্রায় সাতচল্লিশজন সামরিক অফিসারের এক বৈঠক হয়। সেখানে একজন মাত্র অসামরিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। মেজর, ক্যাপ্টেন এবং লেফটেন্যান্ট পদের ওই সব অফিসারই মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত।

যদিও একটি সূত্রে প্রকাশ, ওই বৈঠকে মুজিবকে ঠিক হত্যা করার কথাটা তোলা হয়নি। কথা হয়, প্রথমে মুজিবকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলা হবে। সে যদি রাজি না হয় তখন বলপ্রয়োগ করা হবে। যে-সব সৈন্য সরাসরি খুনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তারা প্রায় কেউই জানত না যে কী ঘটতে যাচ্ছে। এরা সব বেঙ্গল ল্যানচার্স-এর ফার্স্ট ফরোয়ার্ড ডিভিশন এবং ৫৩৫ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্টের ফৌজ।

এগার থেকে চোদ্দ আগস্টের মধ্যে পরপর কয়েকটি বৈঠকে 'খুনের খসড়া'টা পাকা হয়ে যায়। একে রূপ দেওয়ার প্রতিটি ধাপের সঙ্গে ওয়াকিবহাল তিন ব্যক্তি হল মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, জেনারেল ওসমানী এবং খোন্দকার মোস্তাক। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এ সময় নাকি মুজিবকে সতর্ক হতে বলে : 'স্যার, কুর্মিটোলায় বিশ্রী কিছু পাকিয়ে উঠছে। কী সব গোপন বৈঠক হচ্ছে। ব্যাপারটা আমার ভালো মনে হচ্ছে না।' মুজিব ডেকে পাঠালেন মেজর জেনারেল জিয়াকে। তার কাছেই জানতে চান ব্যাপারটা। জিয়া কৌশলে এড়িয়ে গেলেন কথাটা : 'মোশাররফের ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন স্যার। ওকে আপনি জেনারেল করেননি বলেই ও ওইসব কানভাঙানি করছে। আমি তো রয়েছি। কিছু যদি সত্যিই হয়, আপনি আগেই জানতে পারবেন।' জিয়ার জবানে বিশ্বাস করলেন মুজিব। একবারও ভেবে দেখলেন না, এই বিক্ষুব্ধ জিয়াই পদত্যাগের হুমকি দিয়েছে ইতোমধ্যে। তার সে পদত্যাগপত্র তখনো গণভবনের ফাইলে রয়েছে।

সেনা অফিসারদের চক্রান্ত-বৈঠকে প্রথম ঠিক হল, চরম মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য ঢাকার রাস্তায় যে ট্যাঙ্কবহর বেরোবে তার স্বপক্ষে একটা কারণ তো দেখানো চাই। মহড়া দেওয়ার নাম করে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ট্যাঙ্কবহর রাস্তায় বেরোতে শুরু করুক। ব্যাপারটাকে সবাই স্বাভাবিক ধরে নেবে। তারপর এক শুক্রবারের অন্ধকার রাত্রি সেই চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে সহজেই। পনের আগস্টের শেষরাত্রি– সেই শুক্রবার, সেই 'জিরো আওয়ার' মত্ত মৃগয়ার মুহূর্ত।

ঘটনাকে ছক বেঁধে ঘনিয়ে আনা হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি যাবেন। চক্রীরা ঠিক আগের দিনই একটা গ্রেনেড ফাটালো সেখানে। মুজিবকে বোঝানো হল, আত্মগোপনকারী চরমপন্থীরা তৎপর হয়ে উঠেছে, এটা তার লক্ষণ। এ অবস্থায় তাঁর নিরাপত্তার জন্য সেনা তলব করা দরকার। বৃহস্পতিবার মাঝরাতের আগেই ঢাকার রাজপথে অস্বাভাবিক সংখ্যায় ট্যাঙ্কবাহিনী টহল দিতে বেরোল দেখে কিছু শুভানুধ্যায়ী শঙ্কিত হয়ে মুজিবকে যখন সাবধান করে, মুজিব উড়িয়ে দিলেন তাদের কথা। বললেন : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আগামীকাল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশটা যাতে নির্বিঘ্নে হয় সেই জন্যই টহল দিচ্ছে।'

এই ট্যাঙ্ক-টহলের পিছনে আরও একটা ফন্দি করা ছিল। মিশর এই ট্যাঙ্কগুলি বাংলাদেশকে বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার নজরানারূপে দিতে চায়। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় সিনাই মরুভূমিতে ওইগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। ব্যাপারটা রাষ্ট্রপতিকে না জানিয়ে বিদেশমন্ত্রকের উচ্চ মহল দেশরক্ষাসচিব মজবুল হক ও মেজর জেনারেল জিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে। ফৌজি কেনাকাটার ভার তখন জিয়ার উপর। বলা হল, নিরাপত্তা বাহিনীর যা ট্রেনিং রয়েছে তাতে সেনাবাহিনীর কাজের সময় অসুবিধা সৃষ্টি হবে। ওদেরও ট্যাঙ্ক-চালনার অভ্যাস রাখা দরকার। মুজিবকে না জানিয়েই কায়রোর বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রক মিশর সরকারের কাছে ওই ট্যাঙ্কগুলি খয়রাতি হিসেবে পেতে চায়। ওরাও পাঠিয়ে দিল ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক বোঝাই জাহাজ যখন চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়বে কেবল তখনই মুজিবের সামনে ফাইল পেশ করা হল। ফাইল দেখে তিনি চটে আগুন। কেন তাঁকে এড়িয়ে এত কাণ্ড হবে? পেশকরেরা ভিজা বিড়াল সাজলো। গোস্তাকি মাফ করুন, আর হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। মুজিবও 'আর কক্ষনো এরকম হলে দেখে নেবো' বলে শেষ পর্যন্ত ফাইলে সই করলেন। রাশিয়ায় নির্মিত ওই ট্যাঙ্কগুলি বাংলাদেশে পৌঁছানোর পর মুজিবকে নরম রাখার উদ্দেশ্যে জিয়া ট্যাঙ্কবহরের এক কুচকাওয়াজের আয়োজন করল। উনিশ শ' তিয়াত্তরের ষোল ডিসেম্বর বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাজধানী চট্টগ্রামের রাজপথে ট্যাঙ্কবাহিনীর কুচকাওয়াজ হল, ট্যাঙ্ক থেকে কামানগুলি মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলো মুজিবকে। হায়, সেদিন কি মুজিব ভাবতে পেরেছিলেন, ওই নতশির কামানগুলিই কুড়িমাস পর তাঁকেই, তাঁর সরকারকেই তাক করে গর্জে উঠবে?

বিদেশি সাংবাদিকদের তথ্য অনুযায়ী রাত ঠিক সাড়ে বারোটায় 'অপারেশন' শুরু হয়। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ির সার চলে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের দিকে। চারটি ধারায়

বিভক্ত হয় তারা। প্রথম বাহিনীটি এগিয়ে চলে মুজিবের বাড়ি ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রাস্তার দিকে। দ্বিতীয় দলটি এগোয় শেখ মণির সন্ধানে। তৃতীয়টি যায় বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে সরিয়ে ফেলতে। আর চতুর্থ এবং সবচাইতে শক্তিশালী বাহিনীটি অগ্রসর হয় ঢাকার নিকটবর্তী সাভারের দিকে। সেখান থেকে রক্ষী-বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছিল বলেই এই বিশেষ সতর্কতা।

আশঙ্কটা অমূলক ছিল না। সাভারের দিকে সাঁজোয়া বাহিনী এগোতেই প্রতিরোধ এল। একটা কিছু অশুভ শঙ্কায় রুখে দাঁড়াল রক্ষী-বাহিনী। কিন্তু এদিকেও তৈয়ার। শুরু করল গোলা বর্ষণ। রক্ষী-বাহিনীর এগারটি প্রাণ ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। সাথীদের এই মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে নেতৃত্বহীন রক্ষী বাহিনী বাধ্য হল আত্মসমর্পণে।

প্রথম বাহিনীটি গঠিত হয়েছিল বাছাইকরা সৈন্যদের নিয়ে। এদের মধ্যে ছিল ফার্স্ট আর্মড ডিভিশনের বেঙ্গল ল্যানচার এবং ৫৩৫ ইনফ্যানট্রি রেজিমেন্টের সুদক্ষ সৈন্য। বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিল মেজর হুদা। যে-সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রকাশ, মুজিবকে সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করার পরিকল্পনা ওদের ছিল না। প্রথমে মুজিবকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বলা হয় এবং কিছু সময়ও দেওয়া হয় তার জন্য। মুজিব সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের নতুন প্রধান কর্নেল জামিলকে টেলিফোন করলেন তক্ষুনি চলে আসবার জন্য। দ্রুত ছুটে এল কর্নেল জামিল। সেনাবাহিনীকে সে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলল। কিন্তু জামিলকে তারা জানিয়ে দিল, তার হুকুম তামিল করতে তারা অক্ষম। অফিসার এবং সৈন্যরা একটা স্থির লক্ষ্য নিয়েই এই মধ্যরাতে এখানে এসেছে। সে কাজ শেষ না করে তারা ফিরে যাবে না। এর পরই হঠাৎ মেশিনগান গর্জে উঠল। গুলিবিদ্ধ জামিলের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল দরজার সামনে। তারপর? খুনোন্মত্ত সেই পৈশাচিক রাত্রির বীভৎস বিবরণ কে দেবে? কোনোদিন কি প্রকাশ পাবে তার পূর্ণ নগ্নরূপ?

আগস্ট মাসের পৈশাচিক ঘটনা সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল ঢাকার একটি কাগজে লিখেছেন: "সেই অন্ধকারের মধ্যরাত্রে কুচক্রীদের ভাড়া করা এক সুবেদারের গুলি বঙ্গবন্ধুর তলপেটে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে লুটিয়ে পড়েন।" আবুল ফজল সাহেব আরও লিখেছেন, সেই গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনের এক অধ্যায় শেষ হলো।

কিন্তু বাংলাদেশের খুনী মেজররা লন্ডনে গিয়ে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন ওরা মুজিবের বুকে গুলি করে হৃৎপিণ্ডটা বের করে

ফেলে। এসব ব্যাপারে নানা অভিমত শোনা যায়। তবে আবুল ফজল সাহেবের বক্তব্য মোটামুটি সঠিক ধরে নেওয়া যায়। এছাড়া মধ্যরাত্রের কলঙ্কিত অধ্যায়ের সঠিক বিবরণ পাওয়ার আর উপায় কী?

মুজিবের বাড়িতে যখন জল্লাদের তাণ্ডব চলছে, ঠিক সেই সময়ই ১৩/১ ধানমণ্ডিতে নিহত হয় শেখ ফজলুল হক মণি এবং তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। একই সময়ে মিন্টো রোডে খুন করা হয় আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর এগারজন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের সকলকে।

খুনের পর খুন সাবার করে ট্যাঙ্কবাহিনী এসে জমতে লাগল বাংলাদেশ রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্রের সামনে। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর মেজর ডালিমকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো। নির্দিষ্ট সূচীর আগেই বেতারযন্ত্র চালু হয়ে গেল-বিশেষ ঘোষণা হচ্ছে। হতচকিত মানুষ বেতার ঘোষণা শুনল : 'আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বেচ্ছাচারী মুজিব সরকারের পতন হয়েছে। মুজিব নিহত। খোন্দকার মোস্তাক-এর নেতৃত্বে ক্ষমতা এখন সেনাবাহিনীর দখলে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এখন খোন্দকার মোস্তাক।'

চোদ্দ আগস্টের রাত্রি। মোস্তাকের চোখে ঘুম নেই। কাজ হাসিলের ছকটা চূড়ান্ত করার পর তার শুধু মুহূর্ত গোণা। শুধু টেলিফোনের কাছে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা। এই বুঝি বেজে ওঠে ফোন। এই ডাক এল। মিনিটগুলি ঘণ্টার বন্দর ছুঁয়ে রাত্রিশেষের দিকে পাড়ি দিচ্ছে। অস্থির খোন্দকার। আর কতোক্ষণ? ওই-ওই বেজে উঠল টেলিফোন? কে? কোত্থেকে? হ্যাঁ- কুর্মিটোলার ডাক– সোবহান আল্লা! ঘাম ছাড়ল খোন্দকারের। এবার পর পর ফোন। প্রথমে এক বিদেশি দূতাবাসের অভিনন্দন। খোন্দকারও টেলিফোনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুটা বাতচিত করে নিলেন। চরমপন্থীরা আগ বাড়িয়েই সমর্থন জানাল। জামায়েত-ই ইসলামী এবং মুসলিম লীগও খুশবাত মোবারক জানাল। আশীর্বাদ করলেন মৌলানা ভাসানী। মুজিবের জয়বাংলার পরিবর্তে সেই অন্ধকার রাত্রেই রেডিও ঘোষণা– বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

চৌদ্দ আগস্ট গভীর রাতে সশস্ত্রবাহিনীর একটি অংশ মার্চ করে নতুন এয়ারপোর্টে যায়। সেখানে কর্নেল ফারুক আর মেজর রশিদ সৈন্যদের সামনে বক্তৃতা করে। এই মেজর রশিদ হল খোন্দকারের ভাইপো। ফারুকের সঙ্গেও কুটুম্বিতা রয়েছে তার। সৈন্যদের সম্বোধন করে ফারুক বলেঃ 'আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবের ভাষণ আছে। সেখানে তিনি কী বলতে যাচ্ছেন, জানেন? তাঁর বক্তব্য আমরা পেয়ে গেছি। মুজিব সেখানে সাঁজোয়াবাহিনী এবং বেঙ্গল ল্যানচারকে ভেঙে দেওয়া হল বলে ঘোষণা করবেন। সব ক্ষমতা অর্পিত হবে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর। আরও শুনুন।

মুজিব বাংলাদেশকে দিয়ে দিচ্ছে ভারতের হাতে। ইতোমধ্যেই তার সই-সাবুদ পাকা। সুতরাং ভাইসব! আজকের লড়াই, আমাদের অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা এটা ঠেকাবোই। সমগ্র সৈন্যবাহিনী আমাদের পিছনে আছে। শয়তানকে শায়েস্তা করবার ভার আমরা নিলাম। মুজিব সরকারের অবসান ঘটাবোই। ভাইসব, রাজি?

সাধারণ সৈন্যরা ভাবল, এসব নিশ্চয়ই উপর মহলের হুকুমমাফিক কথা। তারা একবাক্যে বললে– রাজি, রাজি।

মিলিটারি ট্রাক, ট্যাঙ্ক সব নিকটেই মোতায়েন ছিল। মেজর রশিদ এবং লেফটেন্যান্ট রফিক হাসান এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে গেল তেজগাঁও বিমানবন্দর ঘেরাও করতে।

অপদস্থ মেজর শফিকুল ইসলাম ডালিমকে এক বাহিনী দিয়ে পাঠানো হল বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্রে। মেজর শাহরিয়ার এবং ক্যাপ্টেন হুদা কিছু সৈন্য নিয়ে চললো মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে শায়েস্তা করতে। সাজো-সাজো করে সবাই বেরিয়ে পড়ার পর হঠাৎ আবিষ্কার হল, গোলাগুলি কেবল একটি ট্যাঙ্কেই আছে, আর সব ফাঁকা। এখন কী হবে? কর্নেল ফারুক এক বুদ্ধি বের করলো চট করে। ওই গোলা-বারুদ ভর্তি ট্যাঙ্কটি দিয়েই সাভারে নিরাপত্তাবহিনীর ছাউনির উপর আক্রমণ চালানো হবে। খতম পর্ব শেষ হলে বাকি ট্যাঙ্কগুলি রাস্তায় টহল দিতে বেরোলেই কাজ চলবে। বিভিন্ন বাহিনী নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল ফারুক, মেজর নূর, মেজর হুদা, মেজর রশিদ আর লেফটেন্যান্ট রসিদ অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলো ধানমণ্ডির দিকে– শেখ মুজিবের উদ্দেশে।

মিরপুর রোড আর ৩২নং রাস্তা যেখানে মিশেছে সেখান থেকে সোবহানবাগ বরাবর ধানমণ্ডি লেকের শেষপ্রান্তের কালভার্ট পর্যন্ত সেনা সন্নিবেশ করা হল। আর কিছু সৈন্য দিয়ে দ্রুত ঘিরে ফেলা হল মুজিবের বাড়ি। তারপরই মুহুর্মুহু গুলি। রাষ্ট্রপতির বাড়িতে প্রহরারত আর্মি প্ল্যাটুন কোনো প্রতিরোধের চেষ্টা করলো না। বরং সামনে তাদের অফিসারদের দেখে তারা হুকুমবরদারের মতো স্যালুট করলো।

প্রথম রাউন্ড গুলির শব্দ পেয়েই শেখ কামাল ছুটে এলো নীচের তলায় রিসেপশানের ঘরে। কোথাও সে টেলিফোন করার চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে ডি.এস.পি. এবং ডি.আই.বি-র কিছু গার্ডকে কসাইয়ের দল সরিয়ে আনে। রিসেপশান ঘরে তারাও তখন। ব্যাপারটাকে শেখ কামাল বোধ হয় ভাবে চরমপন্থীদের আক্রমণ। তাই উদ্যত স্টেনগান দেখেও সে তাদের 'গার্ড'দের সামনে যায়। বলে, 'আমি শেখ কামাল ওরা আমাদের...।' কথা আর শেষ

হল না কামালের। আগেই গর্জে উঠল বন্দুক। গুলিবিদ্ধ কামাল গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

পরিকল্পনা অনযায়ী মেজর হুদা কিছু সৈন্য সঙ্গে করে শেখ মুজিবকে হত্যা করার জন্য ওপর তলার দিকে চলল। মাঝ বরাবর যেতেই হুদা দেখল, সিঁড়ির মুখে মুজিব। গুলির শব্দেই নেমে আসছিলেন তিনি। হুদা বলল, 'স্যার, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

'ও-হো, তোমরা এসেছ!' শেখ সাহেব বললেন, 'দাঁড়াও পোশাকটা বদলে আসি, আর আমার পাইপটা নিতে হবে।' এই কথা বলে উপরে গিয়েই তিনি টেলিফোন করলেন, সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাকে এবং কর্নেল জামিলকে। ততোক্ষণে মেজর হুদা নীচে নেমে এসে ফারুকের কাছে মাফ চাইছে– না, না, আমি পারবো না। শেখ মুজিবকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এ-কথার পর কর্নেল ফারুকই তার ক'জন চামণ্ডা নিয়ে উপরে চললো। সেও সিঁড়ির পরেই মুখোমুখি হল মুজিবের। তৈরি হয়ে তিনি নেমে আসছিলেন। ফারুককে দেখে বললেন, 'আমায় কোথায় নিয়ে যাবে, চলো। কিন্তু কামাল কোথায়? তাকে ছাড়া আমি যাব না। ডাকো তাকে।'

ওরা দেখলো, সর্বনাশ! কামালের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ তখনো বাইরের ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। মুজিব একবার নেমে এলেই তাঁর প্রিয়তম সন্তানের এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখতে পাবেন! হুদা চট্ করে তার রুমাল দিয়ে মুজিবের দু'চোখ বেঁধে ফেলার চেষ্টা করে। ঠিক এমন সময় বাড়ির এক পুরানো পরিচারক চিৎকার করে উঠলো– 'হুজুর, ওরা কামাল ভাইকে খুন করেছে।' এক তীব্র ঝটকায় হুদাকে হটিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলেন মুজিব– 'কী করলে তোমরা? কী ভেবেছো? কেন... কেন আমার কামালকে খুন করলে...। হটাও... যাব না আমি তোমাদের সঙ্গে। ভুলে যেও না আমি শেখ মুজিবুর রহমান... যতোদিন আছি, দেশের সর্বনাশ আমি হতে দেব না... দেব না...।' উত্তেজিত মুজিব উপরের দিকে ছুটে চলল।

মুজিব তখনো সিঁড়ির শেষ ধাপ পেরোননি। পিছন থেকে উপর্যুপরি গুলি! সিঁড়ির উপরই গড়িয়ে পড়লেন গুলিবিদ্ধ বঙ্গবন্ধু। দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল সদ্য-পরা সাদা পাঞ্জাবিটা। শোণিতধারা নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। বিশাল দেহটা একবারের জন্য কেঁপে উঠল। একটা অস্ফুট গোঙানি। তারপর নিথর... নিঃসাড়...। মুজিব নিহত।

বঙ্গবন্ধুর চিরবিদায় বাংলাদেশ থেকে। মহাপ্রয়াণ ঘটল এক মহান আত্মার। তিনটি দশক ধরে কতো দুঃখ, ঝঞ্ঝা, নির্যাতন, কতো দীর্ঘ

কারাবাস দেশের জন্য বরণ করেছেন নির্দ্বিধায়। বিপদকে অগ্রাহ্য করে, প্রলোভনকে জয় করে এগিয়ে চলেছেন দেশের জন্য, জনগণের জন্য অবিচল আদর্শে। তাঁর দেশবাসীর সামনে বারংবার ঘোষণা করেছেন– 'রক্ত আমি দিয়েছি, আরও রক্ত দিতে প্রস্তুত।' সেই মহানায়ক আজ বুকের সব রক্ত ঢেলে দিয়ে গেলেন দেশপ্রেমের বেদীতলে। সেই রক্ত, কমল হয়ে ফুটে থাকবে চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে। তাঁর মৃত্যু নেই।

ঘাতকেরা ধাওয়া করলো উপরে। মুজিবের দেহ ডিঙিয়ে তারা হাজির হল তাঁর স্ত্রী– বেগম ফজিলাতুননেসার সামনে। চোখের সামনে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এই মর্মভাঙা আঘাত, পাথর হয়ে গেছেন ফজিলাতুননেসা। জল্লাদেরা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে তিনি বুঝলেন, এবার তাঁর পালা।

কর্নেল এগিয়ে এসে বললো– আপনি বন্দি, আমাদের সঙ্গে নেমে আসুন। 'না। আমি নড়বো না এখান থেকে।' বেগম মুজিব চেঁচিয়ে উঠলেন– 'পারো তো এখানেই খুন করো আমাকে।' আলোগুলি নিবে গেল হঠাৎ। নীচের থেকে মেইন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার চিড়েই গুলি ছুটে এল। লুটিয়ে পড়লেন ফজিলাতুননেসা মেঝেতে। মুজিবের মৃতদেহের অনতিদূরেই রক্তে ভাসতে লাগলো মুজিবের সহধর্মিনীর মৃতদেহ। এক নিষ্পাপ, অসহায় নারীকে হত্যা করে ঘাতকেরা এবার উন্মত্ত। এবার তারা মেতে উঠলো গোটা মুজিব-পরিবারকেই নিশ্চিহ্ন করতে। কাউকে রাখা হবে না আর বংশে বাতি দিতে। কোনো সাক্ষী রাখা নয় আর।

হায়নার মত একদল নীচতলাটা খুঁজছে। শেখ নাসের আর বাড়ির কিছু পরিচারককে তারা পেয়ে গেল ল্যাবেটরির মধ্যে লুকানো। পরপর গুলি করে ফেলে দেওয়া হলো তাদের। খতম। রক্ত-লোলুপ আর একদল তখন খুঁজে ফিরছে মুজিবের বেডরুম। সেখানে ছিল মুজিবের দুই ছেলে– শেখ জামাল ও রাসেল; আর দুই পুত্রবধূ– রোজী ও খুকী। কিছুদিন হলো কেবল ওরা দুজন বধূ হয়ে এসেছে এ-বাড়ি। ওরাও রেহাই পেল না। জামালের সঙ্গে ওদেরও খুন করল পিশাচরা!

তখনো দশ বছরের কিশোর রাসেল ওই বিভীষিকার মধ্যে কাঁপছে। জানালা দিয়ে রাস্তার আলো এসে পড়েছে সেখানে। পশুগুলির দিকে তাকিয়ে অবোধ কিশোর বলছে– 'আমাকে মেরো না। আমি তো খুব ছোট, আমায় ছেড়ে দাও।' অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো– ভয় নেই, তোমায় মারবো না। আর পরমুহূর্তেই একটা গুলি এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল কিশোরের খুলি। রক্ত মেখে উন্মত্ত উল্লাসে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো জল্লাদেরা। বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডিতে তখন কবরের নীরবতা।

ততোক্ষণে মেজর শাহরিয়ার এবং ক্যাপ্টেন হুদা তাদের হত্যা-অভিযান শেষ করে ফিরে এলারক্ত মেখে ঘেমে। ২৭নং মিন্টো রোডে তারা মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ গুণে গুণে চুয়াত্তরজনকে খতম করেছে। লাশগুলি পাঠিয়ে দিয়েছে মেডিকেল কলেজ মর্গে। লাশ পরীক্ষা করতে এল বরিশালের বরখাস্ত হওয়া মন্ত্রী নুরুল ইসলাম। পরীক্ষা করবে কী? সে লাশগুলি ঘাঁটছে আর চেঁচাচ্ছে– কোথায়, হাসনাতের লাশ কোথায়?

এই হাসনাতের সন্ধানেই ওরা বাজের মতো ছোঁ মেরেছিল সেরনিয়াবাতের বাড়ি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হাসনাত, আগেই তার ভাই খোকনকে নিয়ে পালায়। পালায় কেমন করে তা আজও রহস্যাবৃত।

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার দুঃসংবাদে দিশেহারা হয়ে পড়ে সাভারের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র। বরিশাল, খুলনা, শ্রীহট্ট থেকে নির্দেশ চেয়ে ওয়ার্লেস মেসেজ আসতে থাকে সাভারে। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান তখন লন্ডনে। ডেপুটি ডিরেক্টরও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে। কে তাদের এ অবস্থায় বলিষ্ঠ, নির্ভুল নেতৃত্ব দেবে? আর তখনই ট্যাঙ্কগুলি খুব কাছে এসে গোলাবর্ষণ করতে থাকে নিরাপত্তা ছাউনির উপর।

চক্রান্তকারীরা উল্লসিত হয়ে উঠল এতে। পাকিস্তান রেডিও উর্দু ফিল্মি গানার ফোয়ারা ছোটালো। ঢাকায় তখন কারফিউ। তার মধ্যেই বঙ্গভবনে প্রবল কর্মব্যস্ততা। শপথ বাক্য পাঠ করে মন্ত্রী হচ্ছে এক একজন। রাত্রে যে তিনটি বাড়িতে কসাইরা হানা দিয়েছিল, এখন সেখানে তাদের সেঙাতরা চালাচ্ছে লুণ্ঠন পর্ব। কাড়াকাড়ি চলছে কামালের হাতঘড়িটা নিয়ে। কয়েকজন ঘিরেছে তাঁর গাড়িটা। রুদ্ধবাক ঢাকা শুধু দেখছে সেই দৃশ্য।

কোনোরকম উত্তেজনা সৃষ্টি যাতে না হতে পারে তার জন্য মুজিবের মৃতদেহ একটা বস্তায় ভরা হলো। এবার কেউ দেখতে পাবে না। তারপর এক হেলিকপ্টারে করে তা চালান দেওয়া হলো– ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ায়। অন্য লাশগুলি কোনোরকমে বনানি কবরখানায় মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল। শাস্ত্রাচার কিছু হলো না তাতে। কেউ বললে না– 'খালাক্ না কুম্।'

এবার শুরু ক্ষমতার বিলিবন্দেজ। লুঠের মালে ভাগ বসাতে নেঙটি ইঁদুরগুলি বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। মেজর জিয়াউর রহমান হলেন দেশের সেনাপ্রধান। বিদেশি শক্তির পরামর্শে এম. জি. তোয়াবকে জার্মানি থেকে এনে করা হলো এয়ার ভাইস মার্শাল ও বিমান বাহিনীর প্রধান।

পিঠের ভাগ অন্যরাও পেল– যারা চক্রান্তে ছিল নানাভাবে জড়িত। সেই মাহবুব আলম চাষীকে দেওয়া হলো মুখ্য সচিব বানিয়ে। আলবদর আর

রাজাকার বাহিনীর স্রষ্টা সফিউল আলম হলো কেবিনেট সেক্রেটারি। অনেক 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চললো। যেন শয়তানের 'দানসাগর পর্ব।' জল্লাদ সরকারের গদিনসিন হওয়ার এমন জাঁকালো ব্যাপার-স্যাপারের মধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ হ্যান্ডবিল, লিফলেটে ছেয়ে গেল চারদিক। কী? কী? লেখা ওতে? সবাই বিস্মিত। সেই দুঃসাহসী প্রচারপত্রে লেখা : 'এখনো মরেনি বঙ্গবন্ধুর বংশধর। এখনো তার এক পুত্র জীবিত। খুনীদের যতোদিন বিচার না হয়, যতোদিনে না নেওয়া যাবে এই খুনের বদলা, ততোদিন বিশ্রাম নেই বাঘা সিদ্দিকীর।'

সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে সন্ধান চললো বাঘা সিদ্দিকীর। যে-করেই হোক তাকে ধরা চাই। কিন্তু কেউ তাকে পেলো না। চারদিন ধরে ঢাকায় থেকে 'খুনের বদলা নেওয়ার শপথ' ঘোষণা করে সে চলে যায় তার নির্দিষ্ট ডেরায়। সে গঠন করে চলেছে জাতীয় মুক্তিবাহিনী। নির্ভীক অদম্য সে বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবের বহ্নি আজও অনির্বাণ।

৯

প্রাক-স্বাধীনতাকালে রমনা ময়দান ছিল শুধু রেসকোর্স ময়দান– ঘোড়দৌড়ের মাঠ। কিন্তু এখন এটা বিরাট বিরাট জনসমাবেশের প্রান্তর রূপেই পরিচিত হয়েছে। উনিশ শ' বাহাত্তরের সাত জানুয়ারি এই একবর্গ মাইল বিস্তৃত প্রান্তরই প্রত্যক্ষ করলো এক নবযুগের উন্মেষ। জাতির হৃদয় থেকে উথলে ওঠা আনন্দের বানে সেদিন তরঙ্গায়িত এই রমনা ময়দান। সারা দেশের বাঙালি সেদিন জমায়েত হয়েছে সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে দর্শন করতে। ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর জামানায় নয়মাসেও অধিক কাল ইসলামাবাদের কারাগারে বন্দি থাকার পর মুক্ত মুজিব এই তাঁর দেশবাসীর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সে-উল্লাস-উদ্দাম, উত্তাল।

এই রমনা ময়দানের প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল মুজিবের। পাক সরকারের বিরুদ্ধে বহু সমাবেশ করেছে এইখানে মুক্তিযোদ্ধারা। মুজিবও যে কতোবার এই ময়দানে বিশাল জমায়েতের সামনে বক্তৃতা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সে স্মৃতি তাঁর ভুলবার নয়। ঘনিষ্ঠদের তাই প্রায়ই তিনি বলতেন, আমি মরে গেলে এই উন্মুক্ত ময়দানে আমার মৃতদেহ এনে রাখবে। আমার প্রিয় লক্ষ লক্ষ দরিদ্র দেশবাসী শেষ দেখা দেখতে পাবে। মুজিবের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। ধানমণ্ডি থেকে তাঁর নিহত দেহ বস্তাবন্দি করে কারফিউর যবনিকার তলা দিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় পাচার করা হয়।

তার আগে, বাহাত্তরের এই সাত জানুয়ারিতে ফিরে আসি। বিরাট মঞ্চ তৈরি হয়েছে রমনা ময়দানে। ফুলে ফুলে সাজানো সে মঞ্চ যেন গুলশান। চারদিক ঘিরে জনসমুদ্র। বাসে, ট্রেনে, লরিতে, নৌকোয় জনস্রোত এসে ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়েছে ময়দানে, মিশে যাচ্ছে মানুষের সাগরে। কতোদিন বাদে আজ তারা পাবে তাদের প্রিয় নেতাকে, দু'চোখ ভরে দেখবে মুজিবকে, প্রাণ ভরে শুনবে বঙ্গবন্ধুর বাণী।

মঞ্চের 'পরে সমাসীন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনীর প্রধান, নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের মাঝখানে বসে আছেন এক দীর্ঘকায় কিন্তু দুর্বল, কৃশ ব্যক্তি।

পরিধানে তাঁর সেই সর্বজন-পরিচিত পাঞ্জাবি, পাজামা, ওয়েস্ট কোট। লক্ষ লক্ষ মানুষ উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে তাঁরই কথা শুনতে।

তিনি দাঁড়ালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রোচ্ছ্বাস। মুজিব ভাই–জিন্দাবাদ, বঙ্গবন্ধু–জিন্দাবাদ, জয়বাংলা–জিন্দাবাদ... জিন্দাবাদ– শুধু জয়ধ্বনি– জনোচ্ছ্বাস।

মুজিব শুরু করলেন : 'ভাইয়েরা আমার, মায়েরা আমার!–' কতোদিন শোনা হয়নি, তবু সেই মনমাতানো সুর, প্রাণজাগানো সাড়া, সেই সুপরিচিত কণ্ঠের আহ্বান। কিন্তু, যেন ক্ষীণ অনেক। মুজিব বলে চলেছেন : 'রক্ত আমরা দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। ভাইসব, মনে রাখবেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ ইতিহাস-বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস।'

একটু থেমে মুজিব বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলেছি, গরিবের ওপর, বাঙালির ওপর গুলি করা হয়েছে। আপনি এখানে আসুন, দেখুন। তিনি এলেন না।'

(এ সময় জনতার প্রবল শেম শেম চিৎকার)

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি গেলাম পল্টন ময়দানে। বললাম, কাল থেকে অফিস বন্ধ, কারখানা বন্ধ। আমার কথা সকলে মানল। বললাম, কোনো কিছু চলবে না। চলল না।'

তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে ইয়াহিয়া গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছিলেন। পঁচিশ তারিখ অ্যাসেমব্লি কল করেছেন। অথচ পথের 'পরে আমার ভাইদের রক্ত এখনো শুকোয়নি। আমি বলে দিতে চাই, শহীদদের রক্তের উপর পা দিয়ে মুজিবুর রহমান অ্যাসেমব্লিতে যেতে পা-রেনা।'

(আবার জনতার আকাশ ফাটানো সমর্থন-ধ্বনি)

জনসমুদ্রের সামনে সরাসরি প্রশ্ন করেন মুজিব– আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাস আছে?

একসঙ্গে যেন সহস্র শঙ্খধ্বনি– আছে-আছে-আছে। শ্রোতারা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুজিব বললেন– সিট ডাউন, সিট ডাউন। বসল সবাই। তিনি শুরু করলেন– 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা মানুষের অধিকার চাই। আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কর বন্ধ করুন। আমাদের একটি পয়সাও আর পাকিস্তানে যাবে না। ওরা যদি আমার লোকদের হত্যা করে, তা হলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক পাড়ায় দুর্গ গড়ে তুলুন। যা কিছু আছে তা দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা ওদের

ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যদের বলি, তোমরা আমাদের ভাই। তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আমাদের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা হলে ভালো হবে না। সাতকোটি মানুষকে তোমরা দাবাইয়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি সবাই আমার ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের সকলের। দেখবেন, আমাদের যেন বদনাম না হয়। জয় আমাদের হবেই। আমি রক্ত দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। মনে রাখবেন, আমি কোনোদিন বেঈমানি করি নাই। আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। জয় বাংলা!'

জনসমুদ্রও তখন জয় বাংলা ধ্বনিতে উন্মুখর।

ভাগ্যের কী পরিহাস! মুজিব সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, দেশের জন্য তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু পাকিস্তানিদের হাতে তাঁর প্রাণ গেল না। প্রাণ গেল তাঁর প্রিয় বাঙালিদের হাতে। উনিশ শ' পঁচাত্তরের পনের আগস্ট মুজিব-হত্যার কলঙ্কিত ইতিহাস দিয়ে শুরু হল বাংলাদেশের এক মেঘাচ্ছন্ন যাত্রা।

ভারতে তখন ইমার্জেন্সির অন্ধকার। মুজিবের মৃত্যু সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব পেল না এখানে। কলকাতার খবরের কাগজগুলিতে বঙ্গবন্ধুর কোনো ছবি পর্যন্ত বের হলো না। এর কারণ কেবল জরুরি অবস্থা নয়। আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। রঞ্জিত গুপ্ত তখন পশ্চিমবঙ্গের আই.জি. অর্থাৎ রাজ্যপুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল। তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বন্ধু এবং অন্যতম পরামর্শদাতা। রঞ্জিত গুপ্তর ভাই অশোক গুপ্ত সে সময় ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে পাবলিসিটি অফিসার। এই গুপ্ত-পরিবারের সঙ্গে পাকিস্তানের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। বিশেষ করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সেই কে. এম কাইজার অশোক গুপ্তর বন্ধু। মুজিব-হত্যার খবর চেপে দেওয়ার জন্য এই কাইজারই অশোক গুপ্তর মাধ্যমে কলকাতায় অনুরোধ করে পাঠায়। এবং কাজ হাসিলও করে কিছুটা। অবশ্য ক'মাস পরেই দেখা গেল এই অশোককেই 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' বলে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়।

মুজিবুর যখন ইসলামি সম্মেলন যোগদানের জন্য লাহোর যাত্রা করেন, তার কয়েক ঘণ্টা আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান। কিন্তু মুজিবের মৃত্যুর পর ভুট্টো আবার নতুন করে স্বীকৃতি দিলেন বাংলাদেশকে। খোন্দকার রাষ্ট্রপতির আসনে শোভমান হলেন। জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতারভাষণ

দিলেন তিনি। তাতে বললেন : না, দুর্নীতি তার সইবে না। আত্মীয়-পোষণ, পক্ষপাতিত্ব এসবও চলতে দেওয়া হবে না। তার নজরে কোনো ফারাক নেই হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানে। মুজিবকে নিশ্চিহ্ন করার ঘণ্টাপাঁচেক পরে তিন সেনাপ্রধান এবং পুলিশের বড়ো সাহেবরা রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে কুর্নিশ জানিয়ে এল। আহ্লাদে অষ্ট টুকরো খোন্দকার। কিন্তু হায়, হায়, পঁচাশি দিনের মাথায় তাঁর লাঞ্ছনার একশেষ। তিনি গদিচ্যুত ও গ্রেফতার। আবু সাদাত সায়েম হলেন নয়া রাষ্ট্রপতি।

পনের আগস্ট মুজিব হত্যার সময় এই সায়েম ছিলেন কলকাতার এক হোটেলে। উনিশ তারিখেই তিনি ঢাকা হাজির। বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার সমর সেনও একই সঙ্গে যান। ভারতসীমান্ত পর্যন্ত আমি তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। ঢাকায় যে কী ঘটছে তা তখনো পুরো জানতেন না সায়েম। তাঁর ভয় ছিল, হয়তো তাঁকেও কোতল করা হবে।

মুজিব ইসলামাবাদ থেকে ঢাকা যেদিন ফেরেন, অল্পক্ষণের মধ্যে দেশি-বিদেশি দুনিয়ার সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফাররা তাঁকে ছেঁকে ধরে বঙ্গভবনে। দুই বাহু আন্দোলিত করে হাসিমুখে সকলকে প্রত্যাভিবাদন জানালেন মুজিব। দিল্লির এক মহিলা সাংবাদিক হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে শেখ সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা শেখ সাহেব, ইসলামাবাদ জেলেও কি আপনাকে এই ধূমপানের পাইপটি ব্যবহার করতে দেওয়া হতো?

'নিশ্চয়'– শেখ বললেন, 'ভুলে যাবেন না, আমি সাতকোটি বাঙালির প্রতিনিধি। পাকিস্তানি নেতারা এটা জানেন না তা নয়।'

পাক সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার যখন মুজিবকে গ্রেফতার করতে আসে তখনো তিনি তাদের সোজা শুনিয়ে দিয়েছিলেন, তোমরা কাকে বন্দি করতে এসেছো? জেনে রাখো আমাকে বেঁধে রাখবে, দুনিয়ার এমন কোনো শক্তি নেই।

তিয়াত্তরের নির্বাচনকালে, আমি যখন বাংলাদেশে যাই তখনো দেখেছি মুজিবের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস, সেই বলিষ্ঠতা, জনমনে সেই প্রবল প্রভাবান্বিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করা কারো সাহসে কুলোয়নি। সেই মুজিব কিনা নিহত হবেন কতিপয় বিক্ষুব্ধ বাঙালি সৈন্যের হাতে! কল্পনাতীত ছিল একথা তাঁর কাছে।

প্রবল আত্মবিশ্বাসের ফলে মুজিব যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই তিনি রাষ্ট্রপতির আসনে বসলেন বাংলাদেশে। কিছুদিনের মধ্যে সংবিধান বদল করে হলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই মুজিবই উনিশ শ' পঁচাত্তরে গোটা প্রশাসন কাঠামো ঢেলে সেজে আবার রাষ্ট্রপতি হলেন।

রাজনৈতিক সমস্ত দলকে বাস্তবিকপক্ষে নিষিদ্ধ করে কায়েম করলেন একদলীয় ব্যবস্থা। এবং তাও রইল তাঁর কব্জায়। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে তিনিই বসিয়ে ছিলেন ওই আসনে, আবার তিনিই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বাইরে। মন্ত্রিসভা থেকে বাদ গেলেন তাজউদ্দীন। আরও অনেক কাজ তিনি করলেন। এবং কেউ কিছু বললে বলতেন সে সব আমি বুঝব। জেনে রেখো, আমার নাম মুজিবুর রহমান। এমনি ধীরে ধীরে প্রকট হতে লাগল লোকটির আত্মম্ভরিতা। বস্তুত পক্ষে তিনি হয়ে পড়লেন যেন ডিক্টেটর।

মুজিবের পর খোন্দকার ক্ষমতা নিয়েই ঢাক পিটিয়ে দিলেন, মুজিবের আমলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে-সব চুক্তি হয় তার সবই বজায় থাকবে। আর তলে তলে একটার পর একটা চুক্তি ভেস্তে দিতে থাকলেন। মুজিব নিহত হওয়ার চারদিনের মাথায় ভারতের হাইকমিশনার সমর সেন ঢাকায় পৌঁছেই খোন্দকারের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দর্শন দিলেন না খোন্দকার। হাইকমিশন এবার রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কতকগুলি কথা জানতে চেয়ে এক পত্র দিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রককে। আর সঙ্গে সঙ্গেই, একুশ আগস্ট ইন্টারভিউর ব্যবস্থা হলো। খোন্দকার সমরবাবুকে বললেন, 'বাংলাদেশ'ই থাকছে। তবে বাদ গেল মুজিবুর রহমানের প্রিয় 'জয়বাংলা' কথাটি; চালু হয় 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' স্লোগান। পরে অবশ্য 'বাংলাদেশ নামটাও সংশোধন করে নেয় জঙ্গী প্রশাসন। তিয়াত্তরের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ তখনো ভেঙে দেয়া হয়নি। খোন্দকারের বাসনা ছিল, মুজিব হত্যার ঘটনাবলী ওই পরিষদকে দিয়ে সমর্থন করিয়ে নেবেন। মাসখানেক পরে আওয়ামী লীগের এম.পি-দের এক সভা ডাকা হলো বঙ্গভবনে। দু' শ' নব্বুই জনের মধ্যে মাত্র দেড়শ' সদস্য উপস্থিত হলেন সেই সভায়। বাকিদের কিছু নিহত, কিছু কারারুদ্ধ, অন্যেরা জীবন বাঁচাতে পালিয়ে এসেছেন ভারতে।

তবু যাঁরা সেই সভায় হাজির হন, তাঁদেরই খোন্দকার নানা বয়াত ব্যাখ্যান দিয়ে বোঝাতে চাইলেন, কেন, কী অবস্থায় মুজিব নিহত হন। কিন্তু ফ্যাসাদ হল তাতে। তাঁর ওই বয়াত শোনার ধৈর্য কারো ছিল না। প্রতিবাদের ঝড় উঠল। দাবি উঠল– বঙ্গবন্ধুর হত্যার তদন্ত চাই। খোন্দকারের সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতি লেগে গেল ওই নিয়ে। আস্ফালনে সভাস্থল খণ্ডযুদ্ধে পরিণত। কড়া প্রহরায় খোন্দকার সেখান থেকে দ্রুত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। পরে কিছু এম.পি-কে গ্রেফতার করা হয়। তবে

খোন্দকারের নির্দেশে ওই ভেস্তানো সভার কোনো বিবরণী প্রকাশ করতে দেওয়া হলো না।

অবশ্য সেই সন্ধ্যাতেই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ঘোষণা করা হয় যে 'দুর্নীতিগ্রস্ত মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের দ্বারা যে কোটি কোটি টাকার অপব্যবহার হয়েছে তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হচ্ছে।' ঢাকার রোটারি গভর্নর ই. আলম তখন সস্ত্রীক কলকাতায়। এক সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে এসেছেন। আলম সাহেব একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। সোহরাওয়ার্দির আত্মীয়। হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমরা ক'জন। দেখলাম, আলম সাহেব কেন, তাঁর বেগম পর্যন্ত মুজিবের নাম করতেই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। দুজনেই বললেন, মুজিব এবং তার পরিবার দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের কৃতকর্মের ফল তারা পেল। আলম সাহেব এমন কথাও বললেন যে, মুজিবকে হত্যা করা যুক্তিযুক্তই হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ শেষ করে দিয়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু পরবর্তীকালে ওই সব অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট যখন বেরোয় দেখা গেল মুজিব পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ সাকুল্যে সাত লাখ টাকা মাত্র। তাছাড়া বিদেশের কোনো ব্যাংকে মুজিব বা তাঁর পরিবারের কারো নামে একটি কপর্দকেরও হদিস পাওয়া গেল না। মুজিব দীর্ঘকাল ঢাকার একটি বীমা কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল পাঁচ হাজার টাকা। তাছাড়া ফরিদপুরে তাঁর পৈতৃকসূত্রে প্রায় একশ' বিঘা জমি ছিল। মুজিব পরিবারের সাতলাখ টাকার সম্পত্তির হিসাবটা এই পটভূমিতে বিচার করলে সহজেই সব পরিষ্কার হয়।

ভাগ্যের কী বিড়ম্বনা। মুজিবকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রমাণ করতে পারলেন না খোন্দকার। পক্ষান্তরে খোন্দকারই কিছুদিনের মধ্যে গ্রেফতার হলেন দুর্নীতির দায়ে। বাংলাদেশের মানুষ মুজিবের মধ্যে দেখেছে একজন ডিক্টেটর, দাম্ভিক, দুর্বল এবং একগুঁয়ে নেতাকে। কিন্তু তিনি যে দুর্নীতিগ্রস্ত নন, এটা তারা জানত। অবশ্য দুর্নীতি এবং অন্যায় কাজে কিছুটা জড়িত ছিল শেখের দুই পুত্র– কামাল এবং জামাল। স্নেহান্ধ মুজিব অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর পুত্রদ্বয়ের এই অপরাধ দেখতে পেতেন না।

মুজিব খুন হয়ে যাওয়ার পর একটা প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে, একটা চক্রান্ত যে চলছে এ-কথা জানা সত্ত্বেও ভারত সরকার মুজিবকে বাঁচানোর জন্য কিছু করলো না কেন? সাতাত্তরের ত্রিশ নভেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে এক সাক্ষাৎকার-কালে আমিও এই প্রশ্নটাই তুলি তাঁর কাছে।

শ্রীমতী গান্ধী আমাকে বলেন : কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে আমরাও তা জানতাম। মুজিবকে আমি এ-সম্পর্কে বহুবার সতর্কও করে দেই। কিন্তু তিনি বরাবর আমাকে বুঝিয়েছেন, পাকিস্তানের জেল থেকেই যখন বেরিয়ে আসতে পেরেছি, নিজের দেশের জল্লাদের নিশ্চয়ই এড়াতে পারব।'

এর বেশি কিছু বলতে চাইলেন না শ্রীমতী গান্ধী। একবার কেবল মন্তব্য করলেন, 'আমাদের গোয়েন্দা বিভাগও খুব সতর্ক ছিল না।'

মুজিব খুন হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর কলকাতায় রুস্তমজীর সঙ্গে আমার দেখা হলো। তাঁকে বললাম, দেখলেন তো তাজউদ্দীনের খবর কতো সঠিক ছিল! এরপর তাঁর সঙ্গে আমার ফের দেখা হয় দিল্লিতে, মাস-তিনেক পরে। এই সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের আরো চারজন নেতাকে খুন করা হয়। রুস্তমজীকে এবার বলতে হলো, হ্যাঁ, তাজউদ্দীনের খবরে ভুল ছিল না। ওই ষড়যন্ত্রে জিয়া আর খোন্দকারই ছিল নাটের গুরু।

পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশ পার্লামেন্টের বেশ কিছু সদস্য ভারতে এসে আশ্রয় নেন। কেউ কেউ সেই থেকে এখানেই বাস করছেন। তাঁদের সবারই অভিযোগ যে, ওই সময় ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ এবং তাদের যোগসূত্রগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সোভিয়েত গোয়েন্দাচক্র কী করলো তখন? তাদের কে.জি.বি-র' মতো দুর্ধর্ষ গোয়েন্দাচক্রও ব্যর্থ হলো? এসব তর্ক তুলেও ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের দায়মুক্তি ঘটে না। ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে বিশেষ গোয়েন্দা শাখা 'র'-এর যে লোকটি ছিল, সে অত্যন্ত জুনিয়র, অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তার উপর লোকটি আবার ওই সময়েই ছিল ছুটিতে। অবশ্য এই সময়কার বহু ঘটনাই অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিতর্কিত এবং অত্যন্ত গোপনীয়। অমন একটা মর্মন্তুদ ঘটনা আদৌ এড়ানো সম্ভব ছিল কি না তার সঠিক উত্তর দিতে পারেন কেবল শ্রীমতী গান্ধী, ওয়াই. বি. চবন এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষাকারী গোয়েন্দা বিভাগ।

যাহোক বহু ত্যাগ ও দুঃখদায়ক ঘটনার মধ্য দিয়ে পঁচিশ বছরের তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে দুটি দেশের মধ্যে যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আবার বিবর্ণ হয়ে গেল।

১০

এক নৃশংস হত্যা-অভিযানের শেষে খোন্দকার সাত-ওক্ত নামাজ পড়ে রাষ্ট্রপতির আসনে বসলেন। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মহম্মদ সায়েম তখন কলকাতায়। খুনী মেজররা সুপ্রীম কোর্টের আর একজন বিচারপতিকে পাকড়াও করলেন। দেরি তাদের সয় না। তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন বঙ্গভবনে। খোন্দকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো। এবার মন্ত্রিসভা সাজাতে হবে। মেজরদের নির্দেশে সেনাবাহিনী ধাওয়া করল প্রাক্তন মুজিব-মন্ত্রিসভার সদস্যদের বাড়ি। তাঁদেরও জবরদস্তি ধরে এনে শপথ পাঠ করানো হলো, তাঁরা বাধ্য হয়ে মন্ত্রী হলেন। এদের মধ্যে হিন্দু ছিলেন একজন— মনোরঞ্জন ধর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মনোরঞ্জনবাবু কলকাতায় ছিলেন। তিয়াত্তরের নির্বাচনের পর তিনি মুজিবের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। বাইরের লোককে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাঁকে ওদের দলে জোর করে রাখা দরকার। কিন্তু জোর-জবরদস্তির কাছেও মাথা নত করলেন না মুজিবের ঘনিষ্ঠ পঞ্চপ্রধান— সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, মনসুর আলি এবং ফণী মজুমদার। অবশ্য মাথা নোয়ালেন না বলে জল্লাদরা তাঁদের ছেড়ে দিলেন তা নয়। তাঁরা সবাই নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে।

দেশের উপর সামরিক আইনের খড়গ ঝুলিয়ে দেশ শাসন শুরু করলেন খোন্দকার। মুজিব হত্যার পরদিনই জিয়া বকশিশ পেলেন খোন্দকারের কাছ থেকে। জেনারেল শফিউল্লাকে অপসারণ করে জিয়াকে করা হলো চীফ অব আর্মি স্টাফ এবং ডেপুটি চীফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আসল ক্ষমতা রইল 'সপ্ত-খুনী মেজরের' হাতে। এই 'সপ্ত-খুনী' কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে এল বঙ্গভবনে। এরাই প্রশাসনের নীতি-নির্দেশ স্থির করে। এদের নেতা জিয়া। জিয়ার মাধ্যমে সেই নির্দেশ পৌঁছানো হয় খোন্দকারের কাছে। সেই মতো কাজ করেন খোন্দকার।

কাজ কীরকম চলছিল? বাংলাদেশে তখন যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সে দুর্বিষহ জীবনের অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। অত্যাবশক সামগ্রী হয় নেই, না হয়

দাম তুঙ্গে। আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। চতুর্দিকে ক্ষোভ, গোপনে বিক্ষোভের দিকে এগোচ্ছে আর খোন্দকার শাসন চালাচ্ছেন জঙ্গী আইন আর একটানা তিনমাস কারফিউ বজায় রেখে।

পঁচাত্তরের সেপ্টেম্বরে খোন্দকার ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির অধিবেশন ডাকলেন বঙ্গভবনে। কিন্তু সদস্যদের অনেককেই যে ইতোমধ্যে খুন করা হয়েছে। অনেকে কারারুদ্ধ আর কিছু আছেন প্রাণের দায়ে পালিয়ে। এই অবস্থায় দু শ' নব্বইজন সদস্যদের মধ্যে মাত্র একশ চল্লিশজন সদস্য হাজির হলেন অধিবেশনে। খুনী-সপ্তক-পরিবৃত খোন্দকার সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁকে ইমান দিতে উঠে দাঁড়ালো না কেউ। চোটটা হজম করতে চেষ্টা করছিলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কাঁহাতক পারবেন? তিনি আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যরা প্রায় সমবেতভাবে মুজিব হত্যার জবাব চাইতে শুরু করলেন। তাঁরা খোন্দকারকেই দায়ী করতে থাকেন মুজিব হত্যার জন্য। কেউ বললেন, গ্রেফতার করা হোক, কারো দাবি– বিচার চাই। খোন্দকারের সেঙাতরা বাধা দিতে গেলে বাধল হাতাহাতি, হট্টগোল। বেগতিক দেখে খোন্দকার অধিবেশন স্থগিত বলে কেটে পড়লেন। এবং সেই রাত্রেই ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির গুণে গুণে পঁচাত্তরজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হল। বাদবাকিরা পালিয়ে এলো ভারতে।

তবে তিনমাসের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষা-বঞ্চিত, নিরন্ন মানুষগুলি বুঝতে পারলো যে কী ক্ষতি তাদের হয়েছে। মুজিব দুর্নীতিকে প্রশয় দিয়েছে বলে যে অপপ্রচার চলছিল তা মিইয়ে গেল দু'দিনেই।

খুনী মেজরদের ভূমিকা নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এটা কেমন কথা ওই সপ্তমেজর মিলে দেশটাকে দাবড়ে বেড়াবে, সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে নিয়ে বিদেশি ব্যাংকে জমাবে, আর এদিকে তাদের চ্যালা-চামণ্ডারা মহল্লায় মহল্লায় নারী নির্যাতন পর্যন্ত করে যাবে নির্বিবাদে? মুজিবের হাতে গড়া রক্ষিবাহিনী জেগে উঠলো পাল্টা প্রতিশোধ নিতে। আর্টিলারির একটা অংশ এগিয়ে এল পাশে। এদের নেতৃত্ব দিতে এলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। পঁচাত্তরের অক্টোবরের মাঝামাঝি খুনীরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া ছেড়ে দেয়। এই সময় সেনাবাহিনীর আস্থা অর্জন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাঁর পিছনে ওদের সংগঠিত করে নিলেন। রক্ষিবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীও এদের সঙ্গে একজোট হলো।

দুই নভেম্বর রাত ভোর হতে না হতে প্রায় পাঁচহাজার সৈন্য বঙ্গভবন ঘিরে ফেলে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার চরমপত্র দেয়।

গত্যন্তর না দেখে খোন্দকার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলে একটা রফায় আসবার শেষ চেষ্টা চালায়। আলোচনা চলে সারাদিন এবং রাত্রি পর্যন্ত। শেষপর্যন্ত খোন্দকার 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনুসরণ করলেন। খালেদের দাবি অনুযায়ী খোন্দকার রাষ্ট্রপতির অধিকারবলে জিয়াকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারণ করলেন এবং তাকে অন্তরিন করে রাখলেন ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে।

খোন্দকার বুঝলেন, আসল ক্ষমতা এখন খালেদের হাতেই গেল। কিন্তু তক্ষুণি আর কিছু পথ পাচ্ছেন না খুঁজে। তিন নভেম্বর থেকে খালেদ মোশাররফই সবচাইতে ক্ষমতাবানরূপে প্রতিভাত হলেন। চার মাসের মধ্যে এই দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতা ছিনতাই। খোন্দকারের মাথায় নানা ভাবনা। এ যাত্রা তবু উঁচু চেয়ারটায় বসতে পারছি। কিন্তু পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হতে কতক্ষণ? নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, কামরুজ্জমান আর মনসুর আলী যেদিন জেল থেকে বেরোবে, তখন? মুক্তিযুদ্ধের এই বীর নেতৃবৃন্দ মুজিবেরও ঘনিষ্ঠ। মুজিবকে খুন করার পরই খোন্দকার এদের নানা অছিলায় জেলে পুরে দেন। তারা এখন ঢাকা জেলে পচছে। কিন্তু বাঘ যদি খাঁচা থেকে বেরোয়? ধূর্ত খোন্দকার ব্রিগেডিয়ার খালেদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার অবসরে 'ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন'। খুনীদের কিছু চামুণ্ডা জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করলেন। আর তারা জেলের মধ্যেই খুন করল ওই বন্দি-বীরদের। খুনোন্মত্ত চামুণ্ডারা এরপরই থামেনি, ওদের সমর্থক বলে সন্দেহ যাদের হয়েছে তাদেরই হত্যা করেছে জেলখানার ভিতরে।

এই বন্দি-বীরদের হত্যার খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। ঢাকা রেডিও ঘোষণা করে : জেলের মধ্যে চার নেতার নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে কিছু লোক ধর্মঘট ডেকেছে বলে সরকার জানতে পেরেছেন। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দেশের মধ্যে এখন সামরিক আইন বলবৎ রয়েছে। এ অবস্থায় সভা, সমাবেশ, ধর্মঘট ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা তা ভঙ্গ করবে, তারা ফল ভোগ করবে। তবে ওই 'জঘন্য অপরাধের' তদন্তের জন্য রাষ্ট্রপতি ইতোমধ্যেই তিন সদস্যবিশিষ্ট এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করেছেন।

ওই দিনই সুপ্রীম কোর্টের আসানুদ্দীনকে কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করার কথাও ঘোষিত হলো রেডিওতে। কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়, অপরাধীরা কী করে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে পালাতে পারলো তাও খতিয়ে দেখা হবে। জেলের মধ্যে সেই হত্যা-অভিযানের সময় অন্যান্য বন্দিদের মধ্যে আফজল আলি, হায়দার আলি, মানিক চৌধুরী, ভূপতিভূষণ

চৌধুরী, আবদুস কুদ্দুস মাখন, আনোয়ার জড়ু, আবদুর রহমান, আবদুল হক এবং প্রাক্তন বিদেশ ও কৃষিমন্ত্রী আবদুস সামাদও ছিলেন। কিন্তু কাকে কাকে খুন করা হয় কিংবা নিহতের সংখ্যা কতো তা কেউ জানতে পারল না।

পঁচাত্তরের পাঁচ নভেম্বর জিয়ার জায়গায় খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ হলেন। জিয়াকে অপসারণ করার পরই বেশ কিছু সামরিক অফিসারকেও গ্রেফতার করা হলো। বাকি কিছু অফিসারের 'পরে রাখা হয় কড়া নজর।

মুজিব-হত্যার সঙ্গে জড়িত সামরিক অফিসাররা পালিয়ে ব্যাংককে পৌঁছায়। রাষ্ট্রপতি খোন্দকারের স্টাফ-অফিসার লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক, লে. কর্নেল কে. এ. রশিদ এবং লে. কর্নেল শরিফুল হক ওরফে ডালিম প্রমুখ ওই পলাতক দলে ছিল। সেখানে ফারুক বলে যে তার সঙ্গে বারোজন অফিসার, দু'জন নন-কমিশনড অফিসার এবং সাতজন মহিলা ও শিশু রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর এক ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানে ব্যাংককে পৌঁছেছে। সে আরও জানায় যে, মুজিবের প্রতি অনুগত একদল সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষের পরই গভীর রাত্রে তারা পালায়। সেখানকার মার্কিন ও পাক দূতাবাসকে তারা জানায় যে আপাতত তারা ব্যাঙ্ককে আশ্রয়প্রার্থী। থাইল্যান্ড তাদের পনের দিনের ভিসাও মঞ্জুর করে।

ফারুকের কথা অনুযায়ী, ক্ষমতা দখলের এই দ্বিতীয় দফার অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেয় ব্রিগেডিয়ার খালেদ। ঢাকা ব্রিগেডিয়ার প্রধান কর্নেল জামিলেরও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার আরও খবর, জিয়ার সঙ্গে এয়ার ভাইস মার্শাল জি. এম. তোয়াবকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও অন্তত বারোজন অফিসারের নাম করে সে, যারা খোন্দকারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার লালসায় ক্ষুব্ধ। এদিকে খালেদ হলো মুজিবের অনুগত। মুজিবের জামানায় উচ্চপদে আসীন যে-সব অফিসারকে খোন্দকার নীচেকার বিভিন্ন পদে রেখেছিলেন তারাও খালেদের সঙ্গে দ্বিতীয় অভ্যুত্থানে অংশ নেয়।

ফারুক বলে, তার মতো খোন্দকারের অনুগত অন্য অফিসাররা পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ পায়নি; বরং বাংলাদেশ থেকে পালাতেই তাদের প্রতি নির্দেশ জানায়। সে বলে, তিন ব্যাটালিয়নের এক ইনফ্যানট্রি যখন শহরের মধ্যে ঢুকল তখনই তারা সবাই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। এর আগেই ওই সৈন্যরা ঢাকা এয়ারপোর্টের বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এবং ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশপথ অবরোধ করে। রেসকোর্স এবং নবাববাড়ি এলাকা থেকে

ট্যাঙ্কগুলি ক্যান্টনমেন্টে ফেরত পাঠানোর জন্য সামরিক অফিসারদের দাবির কাছে নত হননি খোন্দকার। সে স্বীকার করে, খোন্দকারই খুনীদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে এই অভ্যুত্থানের নায়কদের অনুরোধ করেন। তার দাবি, আগেকার অভ্যুত্থানের পুরো কৃতিত্ব তার। তবে তখন অতগুলি খুন অযথা হয়েছে বলে সে কবুল করে।

ডালিমের দল ব্যাংককে পৌঁছলে থাইল্যান্ডের মার্কিন ও পাক দূতাবাসের অফিসাররা জানায় যে, ওই পলাতকদলে সদস্য সংখ্যা উনত্রিশ। দলটির কাছে থাইল্যান্ডে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ভিসা নেই। মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র জানান, দলটির ব্যাংককে উপস্থিত হওয়ার খবর তারা পান লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানের এক টেলিফোনে। তবে সে কোনো রাজনৈতিক আশ্রয় চায়নি তাঁদের কাছে।

পঁচাত্তরের পাঁচ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ গ্রেফতার করেন খোন্দকারকে। তবে তার আগে খোন্দকারকে দিয়ে এক ঘোষণাপত্রে সই করিয়ে নেয়। এতে খালেদ জেনারেলের পদে উন্নীত হন এবং জিয়ার জায়গায় খালেদই হন চীফ অব আর্মি স্টাফ বা সেনাপ্রধান। বেয়নেটের মুখে এই সইটি সেরে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাতে পারলেন খোন্দকার। কিন্তু তাঁকে বিদায় নিতে হলো বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চ থেকে। ছয় নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মহম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি হলেন খালেদের অনুরোধে। তাঁকেই করা হলো একই সঙ্গে চীফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিসট্রেটর। দেশের মানুষও এটা মেনে নেয় বলে মনে হলো। সায়েম রাষ্ট্রপতি হয়ে প্রথমেই ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি ভেঙে দেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে জেনারেলদের হুকুমেই চলতে হবে।

খোন্দকার ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি বা জাতীয় পরিষদ রেখে দিয়েছিলেন তার কারণ, তিনি ভেবেছিলেন তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নটা এই পরিষদকে দিয়েই অনুমোদন করিয়ে নেবেন। সফল হলো না সেই খোয়াব।

সায়েম জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বলেন, একজন নিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে তিনি এই অন্তবর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন, এর মধ্যে কোনো দলীয় সংকীর্ণতা নেই। বিদেশনীতি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। সে চায় বৃহৎ শক্তিগুলির বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা। অপর দেশের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সে বিরোধী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে-সব চুক্তি রয়েছে তাকে মর্যাদা দেওয়া হবে। তা ছাড়া এই উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমনের জন্যও তাঁর সরকার

চেষ্টা করে যাবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। ইসলামিক সম্মেলন, জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন এবং কমনওয়েলথ সম্মেলনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ বোঝাপড়া করে চলবে তাঁর সরকার। তাঁর সরকার বিশ্বশান্তির জন্যও প্রয়াসী থাকবে, ইত্যাদি।

এত সবের জন্য তাঁকে আর পরিশ্রম করতে হলো না। সাত নভেম্বর জিয়া ক্ষমতা দখল করলেন। প্রথমে একটা গুজব ছড়ালো যে, ভারত বাংলাদেশকে আক্রমণ করেছে। কিছু সৈন্য হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে খুব কেরদানি দেখাতে থাকে। সাত নভেম্বরের এই সরকার-ছিনতাইয়ের প্রধান পাণ্ডা শ্রীহট্টের আতাউল গণি ওসমানী। এবারেও খুন-খারাবির অবধি রইলো না। সেই মুজিব হত্যার মধ্য দিয়ে যে রক্তধারা বইতে শুরু করে তা আর শুকোতে পারেনি। শুধু খুন আর লাল রক্ত বয়ে চলেছে অবিরল। কতো প্রাণ বলি হলো এ খেলায়? ঢাকার রাজনৈতিক মহলের ধারণা চল্লিশ হাজারের কম নয়। তবে সঠিক হিসাব বুঝি কেউ কোনোদিন দিতে পারবে না।

১১

জিয়া নভেম্বরে ক্ষমতা দখল করেই খালেদকে দুনিয়া থেকে সাফ করে দেন। আওয়ামী লীগের নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী মিজানুর রহমান কলকাতায় আমাকে এ-সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। তাঁর খবর: খালেদের ক্ষমতা দখলের পর প্রাক্তন সেনাপ্রধান জিয়া, কর্নেল ওসমানী এবং সদ্য পাকিস্তান প্রত্যাগত অন্য অফিসাররা এক বৈঠকে শলা-পরামর্শ করে নেয়। তারপরই রটিয়ে দেয় যে, বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য রাখবার জন্য খালেদ ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছে। ভারতীয় সৈন্যদের এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতেই হবে বলে তারা হল্লা জুড়ে দিল। ব্যারাক থেকে পথে বেরিয়ে পড়ল সৈন্যরা। ক্ষোভ জাগলো সাধারণ মানুষের মধ্যেও। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ-প্রদর্শন হলো। এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করে জিয়া ডাকলেন খালেদের দেহরক্ষীকে। তাকে বললেন, খতম করো ওই দুশমনকে। হুকুম তামিল। দেহরক্ষীর হাতেই খুন হলেন খালেদ। সেনাবাহিনীতে এবার আর জিয়ার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না কেউ।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারত-বিদ্বেষ এমন চরমে আনা হলো যে, ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন যখন অফিসে যাচ্ছিলেন তখন একদল বিক্ষুব্ধ তরুণ তাঁকে লক্ষ করে গুলি চালায়। ভারতে তখন ইমার্জেন্সির অন্ধকার। তবু এর বিরুদ্ধে ভারতের রোষ চাপা গেল না। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এর তীব্র নিন্দা করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সায়েমকে লিখলেন : ভারত-বিরোধী প্ররোচনা বন্ধ করুন, না হলে ভারত এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

সায়েম সঙ্গে সঙ্গেই বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে তিন-সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পাঠালেন দিল্লিকে তোয়াজ করতে। তাঁরা শ্রীমতী গান্ধী এবং ওয়াই. বি. চবনকে অনেক রকম আশ্বাস দিলেন, ভারত-বিরোধী প্রচার একদম বন্ধ করে দেবেন তাঁরা। ভারতকে তাঁরা বড়ো বন্ধু মনে করে ইত্যাদি। এর সবগুলিই ছিল ফাঁকা বুলি। বস্তুত জিয়া, তোয়াব এবং এম.

এইচ, খাঁ এই সেনানায়কত্রয়ী একজোট হয়ে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করে দেয়।

আগস্ট অভ্যুত্থানের পর তোয়াব হয় বিমানবাহিনীর প্রধান। কিন্তু লোকটি ক্ষমতা-লিপ্সু আর গোঁড়া-রকম সাম্প্রদায়িক। সে কিছুদিনের মধ্যেই কমান্ড-লীডারদের নিয়ে সোহরাওয়ার্দি গার্ডেনে এক বৈঠক করে। জিয়া টের পেয়ে গেলেন তা। তিনি বুঝলেন ক্ষমতা দখলের সময় যারা তাঁকে সাহায্য করে তারা আজ ক্ষমতার ভাগ চায়। এদের জব্দ রাখা দরকার। মুজিব-হত্যার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের তিনি কয়েক মাসের মধ্যে পুর্নবহাল করলেন। পিকিং-এ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব করে পাঠানো হলো মেজর ডালিমকে। অন্যদের অনুরূপ পদমর্যাদা দিয়ে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে পাঠানো হয়। এভাবেই সুরাহা হলো ঘাতকদের অস্থির, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বাদ গেল কেবল দু'জন ট্যাঙ্ক কমান্ডার কর্নেল ফারুক রহমান এবং খোন্দকারের ভাইপো আবদুস রশিদ। ঘাতকদলের মধ্যে এই দু'জন সব সময়ই জিয়া-সরকারের সমালোচনা করে আসছে। তারা ঢাকায় হাজির হলো। জিয়াকে জানিয়ে দিল, লুঠের মাল এই ক্ষমতা। এর যোগ্য হিস্যা না পেলে তারা তা আদায় করতে লড়ে দেখবে একবার।

রশিদ ব্যাংককে বলে যে জিয়ার পক্ষে ফারুককে সরানো অতো সহজ হবে না। হয়তো রক্ত নদী বয়ে যাবে বাংলাদেশের উপর দিয়ে। ফারুক ট্যাঙ্কবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলে। জানতে পেরে জিয়া তাকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। এবং সোজা বলে দেন, যদি বাঁচতে চাও অবিলম্বে বাংলাদেশ ত্যাগ করো। ফারুক দেশ ত্যাগে বাধ্য হলো। ফারুকের সঙ্গে আর যারা ছিল তাদের মধ্যে পয়লা সারির দু'জন মেজর নূর চৌধুরী এবং মেজর তালেব বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কাজ করতে অস্বীকার করে।

বাংলাদেশের রাজনীতির মঞ্চ থেকে তোয়াবের পতন কোনো ঘটনাই নয়। বরং এটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, আগেও আমি বলেছি পনের আগস্টের অভ্যুত্থানের আগে এবং পরে যা কিছু ঘটেছে তার সঙ্গে যে কোনোভাবেই হোক জিয়ার ভূমিকা ছিল। বিদেশি চক্রও যে-সব কাজ করেছে তারও কেন্দ্রপুরুষ জিয়া। খোন্দকার, তোয়াব এবং অন্যান্যরা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাত্র। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের ব্যক্তিবিশেষকে কাজে লাগানো হয়েছে এবং 'কাজ ফুরোলেই পাজি' হয়ে গেছে তারা।

বিদেশি চক্রান্তকারীরা তোয়াবকে কাজে লাগিয়েছেন জিয়ার জন্য। সামনে তারা সাজিয়ে রাখত তোয়াবকে। আড়ালে থাকতেন জিয়া। তোয়াব ছাড়তো সাম্প্রদায়িক জিগির। জাতীয়তাবাদীরা এর ফলে তার প্রতি বিরূপ

হয়ে জিয়ার দিকে ফেরে। আর চক্রান্তকারীরা ধুয়ো তোলে জিয়া বেজায় জাতীয়তাবাদী। তোয়াবের বাধাতেই তিনি তাঁর নীতি নিয়ে এগোতে পারছেন না। আমেরিকা একশ্রেণির প্রেস ভারতকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে জিয়া যদি বাংলাদেশের নেতৃত্ব পায় তবে তিনিই হবেন ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আয়ুব সম্পর্কেও আমেরিকা অনুরূপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করে উনিশ শ' আটান্নতে।

জিয়ার নির্দেশেই দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদীরা নির্বিচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, প্রহৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে। মুজিবপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে শত্রুতার বিষ ঢোকানো হয়েছে তারই প্রয়াসে। এভাবে শেষ করা হয় তাঁদের রাজনৈতিক জীবন। কিছু হতাশ দেশপ্রেমিক তোয়াবের বিতাড়নে খুশি হলো। তাদের ধারণা, এতে তাদের আসল শত্রু শায়েস্তা।

১২

খোন্দকারের ক্ষমতা খোয়া যেতে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা পড়ল বেকায়দায়। শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তান মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে লাইন করার ফন্দি করে। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর আর নুরুল ইসলাম মঞ্জু চলে গেল ইসলামাবাদ। তারা কথাবার্তা চালায় পাকিস্তান আর বাংলাদেশের পুনর্মিলনের প্রস্তাব নিয়ে। এরপরই দেখা গেল সেখান থেকে মৌলানা জামাল কাঁই উভয় দেশের পুনর্মিলনের প্রস্তাব নিয়ে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ ঢাকায় হাজির। মৌলানা জামাল তখন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক।

মৌলানার এই পাঁচদফার প্রস্তাবটির রচয়িতা হলেন, খাজা মহীরুদ্দীন, শফিকুল ইসলাম, হামিদুল হক চৌধুরী এবং মকুদ আলি। ঊনিশ শ' সত্তরের নির্বাচনে এরা সবাই মুজিবের আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের কাছে হেরে যায়। একাত্তরে এরা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শেষে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুজিব সরকার কেড়ে নেয় এদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব। এবং জিয়া এদের ফিরিয়ে দেন সে অধিকার।

রাওয়ালিপিন্ডিতে ভুট্টোর সঙ্গে বাংলাদেশের ওই পাঁচ মুরুব্বির বাতচিতের পরই জামাল মিয়া ঢাকা আসেন পুনর্মিলন প্রস্তাব নিয়ে। খোন্দকারের সঙ্গে কথা বলে পিন্ডিতে ফিরে যান এবং সেখানে সব কথা জানিয়ে আবার চার ডিসেম্বর ঢাকা প্রত্যাগমন। এই ফাঁকে খোন্দকারও ঢাকাতে পুরানো মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন ওই মিলন প্রসঙ্গ নিয়ে। এদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান, ভাসানীর ন্যাপ-এর আলিমান রাজি, জামায়েত-ই-ইসলামির ফরিদ আহমেদ প্রমুখ। আওয়ামী লীগের মধ্যেও খোন্দকারের নিজের লোক ছিল। একটা মিলন মাহফিলের জন্য এদের সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়। তবে জিয়াগোষ্ঠী এতে তেমন উৎসাহ দেখাল না।

এই সময় রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামার ছাব্বিশতম ধারাটি প্রত্যাহার করে নতুন নির্দেশ জারি হয়। উনিশ শ' একাত্তরে ওই ধারা জারির ফলে

বাংলাদেশে পাকিস্তানি শিল্পপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সংশোধিত এই নির্দেশনামায় ওই সব ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা হলো।

ক্ষমতা খোয়ানোর পর খোন্দকারগোষ্ঠী কিছুতেই কায়দা করতে না পেরে সাধারণ মানুষের সমর্থন হাতানোর ফিকির করে। তাঁরা ছিয়াত্তরে নির্বাচন করার দাবি তোলে। কিন্তু জিয়ার অনুগামী সামরিকগোষ্ঠী তখন নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে নারাজ। অপরদিকে আতাউর রহমান, সবুর খান, শাহ আজিজুর রহমান, হাসিমুদ্দীন প্রমুখ প্রাক্তন মুসলিম লীগ নেতারাও রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো পদেই খোন্দকারের মত লোককে দেখতে চান না। তাঁদের কথা, তাঁরা কি বেকার রাজনীতিতে চুল পাকিয়ে বসে আছেন? কিছু করতে হয় তো তাঁদের কাউকে নেতৃত্বে বরণ করতে হবে।

পুরানো মুসলিম লীগ নেতাদের খুশি করতে এবং বিশেষ করে যাঁরা সোহরাওয়ার্দির ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের বাগাতে খোন্দকার এক বুদ্ধি খেলালেন, তাঁর দলের নাম হবে 'সোহরাওয়ার্দি মুসলিম লীগ।' এ নামটা যাতে সবার গ্রহণযোগ্য হয় সেজন্য মইনুল হোসেন সব গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

এই মইনুল হলো ইত্তেফাকের সেই সাবেক সম্পাদক মানিক মিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুজিব যখন আওয়ামী লীগ ভেঙে দেন তখন এই ব্যক্তিই তার প্রতিবাদে পার্লামেন্টের সদস্যপদ ত্যাগ করে। সেই থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার একটা বিশেষ ভূমিকা দেখা দেয়।

নিষিদ্ধ জামায়েত-ই-ইসলাম গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা গোলাম আজম দীর্ঘ পাঁচবছর পাকিস্তান প্রবাসের পর ঢাকায় এসে আবার রাজনীতি শুরু করে। তবে খোন্দকারের 'সোহরাওয়ার্দি মুসলিম লীগের' সঙ্গে যোগদানের কোনো ইচ্ছা সে দেখাল না। সে রইল তার জামায়েত নিয়েই। আর জঙ্গী সরকারের কথা হলো স্বীকৃত দল থাকবে একটাই যার নাম 'জাতীয় সংহতি ফ্রন্ট।' এবং এতে সামরিক অফিসার, জওয়ানরাও সদস্য হতে পারবে। প্রতি নির্বাচনী কেন্দ্রে এই দলের দু'জন করে প্রাথমিকভাবে মনোনীত হবে।

এদিকে মুজিব-সমর্থক যে সব কূটনৈতিক প্রতিনিধি বাইরে ছিলেন একে একে তাঁরা জঙ্গী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে লাগলেন। তাদের অভিযোগ, বাংলাদেশের বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। লন্ডনে রাষ্ট্রদূত আবদুর রেজ্জাক এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন: 'জাতীয়তা, সমাজবাদ, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা' এই চারটি আদর্শের স্তম্ভের উপর দাঁড়ানো ছিল বাংলাদেশ, তাকে ধুলিসাৎ করা হয়েছে। কূটনৈতিকবৃত্তিতে রেজ্জাকের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। যুগপৎ পাঁচটি উত্তর

ইউরোপীয় দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। জঙ্গী সরকারের অনুসৃত নীতির প্রতিবাদে তিনি রাষ্ট্রদূতের পদে ইস্তফা দেন। এর পর তিনি সুইডেনে থেকে তাঁর দেশ ও দেশবাসীর জন্য কাজ করে যাবেন বলে জানান। তিনি বলেন: 'বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমানকে আগস্ট অভ্যুত্থানে হত্যা করা হয়। সেই থেকে বাংলাদেশে কী ঘটছে তার দিকে আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। এবং সবকিছু দেখেই আজ পদত্যাগ করতে বাধ্য হই।'

রেজ্জাকের অভিমত হলো, জাতির প্রতি যে-সব প্রতিশ্রুতি আগে দেওয়া হয়েছিল তার একটিরও মর্যাদা রাখেনি ঢাকার বর্তমান প্রশাসকরা। এই কাজটা সারা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে, ধাপে ধাপে। প্রমাণ হিসেবে তিনি 'জয় বাংলা' স্লোগান পাল্টে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' স্লোগান আমদানি করার ব্যাপারটাই জনগণকে ভেবে দেখতে বলেন। এটা কি পাকিস্তানি স্লোগানের মতো শোনাচ্ছে না? তাঁর প্রশ্ন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আঁতাতকারীরা পুর্নবহাল হয়েছে। সেনাবাহিনীকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে যাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে স্থান করে দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী নোংরা লোকগুলিকে।

রেজ্জাক অভিযোগ করেন, জিয়ার উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে অন্তত সাতজন রয়েছে যারা আগে ছিল আয়ুব খাঁর মোসাহেব। বর্তমান প্রশাসকের প্রতিশ্রুতি ছিল দলীয় রাজনীতির বাইরে এক নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকার চালাবেন তিনি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মূলনীতিগুলিকে তিনি ধূলিসাৎ করেছেন।

বেশ জোরের সঙ্গে রেজ্জাক বলেন, মুজিবকে তার দেশের লোক হত্যা করেনি। তিনি নিহত হয়েছেন বিদেশি চরদের চক্রান্তে। মুজিব নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, কয়েকজন মেজরকে দেশ থেকে পালানোর সুযোগ দেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাংককের মাধ্যমে লিবিয়ায় তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র আছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কূটনীতিবিদ রেজ্জাকের এই কথাগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

এতদিন যে সব সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এজন্য রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিন্যান্স জারি করে। সরকারি প্রেসনোটে তার বয়ান প্রকাশিত হয়। উনিশ শ' একাত্তরে ভারতের কাছে ঢাকার আত্মসমর্পণের আগেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন দশ ডিসেম্বর যশোরের

এক জনসমাবেশে ওই দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। পরে বাহাত্তরে তা সংবিধানের ত্রিশ নং ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ গণপরিষদ থেকে তা অনুমোদিতও হয়।

সায়েম-এর ঘোষণার ফলে পনেরটি বেআইনি দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। মুসলিম লীগ, জামায়েত-ই-ইসলাম, নিজাম-ই-ইসলাম, আল-সাম্‌স, আলবদর দলগুলি সব বদর বদর করে ফের পাল তুলে দেয় বাংলাদেশের রাজনীতির ঘোলা দরিয়ায়।

নয়া নির্দেশে অবশ্য ন্যাপ (মুজফ্‌ফর গোষ্ঠী) সি.পি.বি, জে.এস.এ এবং আওয়ামী লীগের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। এই ঘোষণার আগে সবুর খান, আলাউদ্দীন প্রমুখ সাম্প্রদায়িক নেতারা সায়েম-এর সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিও ছাড়পত্র পাওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে।

১৩

উনিশ শ' সাতাত্তরের এপ্রিলে সায়েমকে সরিয়ে নিজেকে আরো মজবুত করে নিলেন জিয়া। একই সঙ্গে তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সর্বোচ্চ ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাঁর প্রথম কাজ হলো সেনাবাহিনী থেকে মুজিব-ভক্তদের সমূলে উৎপাটন করা। এদেরকেই তাঁর ভয়, এরাই তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক। জিয়ার আর এক ভাবনা : সশস্ত্র বাহিনীতে শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। সেই একাত্তর সাল থেকে পঁচাত্তরের পনের আগস্ট পর্যন্ত দেশের মধ্যে যে ঘটনাবলী চলছে তাতে সর্বস্তরে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। এসব সিধে করা দরকার। ডিফেন্স ফোর্স-এর যে সব অফিসার জিয়ার প্রতি বিরূপ বলে সন্দেহ হলো তাদেরকে হয় বরখাস্ত নয় পদত্যাগে বাধ্য করা হল। জনপ্রিয়তায় যাদের শিকড় আরো গভীরে তাদের উপড়ে ফেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিদেশে। যাদের নিয়ে ঝামেলা বাধার ভয় ছিল, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় তাদের। আর জিয়ার জঙ্গী জামানায় সে বিচারের কী রায় হতে পারে তা সবারই জানা ব্যাপার।

অফিসারদের নিয়ে যে সমস্যাটা তা না হয় এভাবে কাটানো গেল। কিন্তু মুশকিল সাধারণ সৈন্য অর্থাৎ সেপাইদের নিয়ে। ওদের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রাখার উপায় কী? ওদের মধ্যে অবাধ্য যারা, তাদের তাড়িয়ে দেবেন, না কি খতম করবেন? তাতে যদি বিক্ষোভের আগুন গোড়া থেকে জ্বলতে শুরু করে! অনেক ভেবে জিয়া ঠিক করলেন, সৈন্যবাহিনীতে ব্যাপকভাবে নতুন লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। নতুনেরা পুরনোদের ছাপিয়ে যাবে সংখ্যায়। আর প্রথম দিকে তারা সুশৃঙ্খল থাকবে চাকরির ভয়ে। তাছাড়া সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞতায় জিয়া আরও একটা জিনিস বুঝেছিলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক যা গঠন তাতে শক্তি-কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রবণতাই সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে থাকবে। আরও একটি ব্যাপার। মুজিব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে বিশেষ আমল দেননি। তাঁর ওই উপেক্ষাকে সৈন্যদের মধ্যে প্রচারের কাজে

লাগালেন জিয়া। সৈন্যদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাদের মন খানিকটা জয় করলেন তিনি কৌশলে।

তার আর একটা কাজ : সংবিধান থেকে মৌলিক নীতির অন্যতম 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটা বর্জন। মৌলিক আদর্শের ক্ষেত্রে সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদ সংশোধন করে একটি নতুন ধারা যুক্ত হলো। তাতে বলা হলো: 'ইসলামিক সংহতির ভিত্তিতে এই দেশ মুসলমানি দেশগুলির মধ্যে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং তাকে রক্ষা করার প্রয়াস সর্বদা চালিয়ে যাবে।'

এই ধরনের সাংবিধানিক সংশোধন দেখে সেদিন অনেকেই ভবিষ্যতবাণী করেন, বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে আর দেরি নেই। এটাও প্রকাশ পায় যে, ইরান যে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া তথা ইরানকে নিয়ে এক আঞ্চলিক জোট গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে তাতে জিয়া সর্বতোভাবে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্বার্থের দায়েই জিয়া মুসলমানি দেশগুলির ঘনিষ্ঠ হন। তাছাড়া তিনি বুঝেছিলেন, এখানে গদি পোক্ত করতে হলে সাচ্চা মুসলমান বলে নিজেকে জাহির করা দরকার। কিন্তু যারা চায় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র, তাদের তিনি কী করে শান্ত করবেন? তাদের জন্য সংবিধান সংশোধনে এক নয়া ব্যাখ্যা দিলেন জিয়া। এতে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা হলো 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার' বলে। এ দ্বারা তিনি দেশটা যে রুশ বা চীনা সমাজবাদের দিকে যাচ্ছে না তা বুঝিয়ে দেন। ন্যাপের রুশপন্থী নেতা মুজফ্ফর আহমেদও আমাকে একদিন বলেছিলেন, সমাজবাদের আগে ধর্ম। জিয়াও দেখালেন, তাঁরও একই লাইন।

মুজিবের সময় থেকে আরব দেশগুলি, বিশেষ করে সৌদি আরব এবং লিবিয়া বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল। বাহাত্তরে, এপ্রিলের শেষ দিকে জিয়া আরব দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ঘন ঘন মিলিত হচ্ছিলেন। তারা জিয়াকে আশ্বাস দেয়, বাংলাদেশ নিজেকে মুসলমানি রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আরব দেশগুলি তাকে ঢালাও সাহায্য দেবে। রাষ্ট্রপতির আসনে বসেই জিয়া তাই সৌদি আরব সফরে চলেন। সেখানে কেবল হার্দিক সম্বর্ধনাই পেলেন না, তিনি সেই সঙ্গে আশি কোটি টাকার একটি চেকও পেলেন। খানাপিনার পর ভোজনদক্ষিণা।

জিয়ার জিয়ট বেড়ে গেল এতে। ফিরেই ঘোষণা : রেফারেনডাম, জনমত গ্রহণ করা হবে ত্রিশ জুন। জনগণ যে তারই পিছনে এটা তিনি দেখাতে চান।

কিন্তু জিয়ার এই রেফারেনডাম বা গণভোটে যোগ দিতে কোনো উৎসাহ দেখা গেল না জনগণের মধ্যে। ভোটদান কেন্দ্রগুলি প্রায় ফাঁকা গেল। ভোটার বলতে দেখা গেল শুধু সেনাবাহিনীর লোকদের। ঢাকা থেকে এক বিদেশি সাংবাদিক খবর পাঠালেন, এ ভোট নয়। ভোটের অভিনয়। পুরো রিগিং। দুপুরের আগেই শেষ। কলকাতার এক সাংবাদিকের মন্তব্য, এ ব্যাপারে জিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আর পাকিস্তানের ভুট্টোকেও টেক্কা দিলেন। এত করেও জনগণের আস্থাভাজন হতে পারলেন না জিয়া। দেশের লোক এই রেফারেনডাম না মেনে দাবি তোলে– জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে, সাধারণ নির্বাচন চাই।

অগত্যা জিয়া এক সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকলেন। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের দাবি উঠল। সবাই বলে অবিলম্বে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে হবে। বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া সে কোনো কিছুই মানতে রাজি নয়। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ইউনিয়ন পরিষদ এবং ঢাকার পৌর নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের দ্বারা আওয়ামী লীগ তার মর্যাদা দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সেনাবাহিনীর মধ্য থেকেও বিভিন্ন গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীর চাপ আসতে থাকে জিয়ার উপর। জিয়া তখন ওদের একে অপরের বিরুদ্ধে যাতে লেগে যায় সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা তখন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। ইনি প্রাক্তন আয়ুব সরকারে মন্ত্রী ছিলেন। এ ছাড়া সৌদি আরব, লিবিয়া এবং ইউ. এস. এ-র দূতাবাসগুলি থেকেও পরামর্শ আসতো জিয়ার কাছে। তাদের পরামর্শে সাতাত্তরের বাইশ এপ্রিল বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি করা হলো বিচারপতি সাত্তারকে। এরপর জিয়া চেষ্টা করেন আওয়ামী লীগের মধ্যে ফাটল ধরাতে। চেষ্টাটা অবশ্য অনেকদিন থেকেই চালাচ্ছিলেন। টোপ গেলার চেষ্টাও যে কেউ কেউ করেনি তা নয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের ছাত্র, যুবক, কৃষক ও শ্রমিকদের সতর্ক প্রতিরোধে তা সফল হয়নি।

মুজিব-সমর্থকদের ঘায়েল করতে গিয়েও তিনি ব্যর্থ হন। মুজিব-বিরোধীদের চাঙ্গা করে তুলতে তিনি দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী দুই মুজিব-বিরোধী গোষ্ঠীর অনেককেই জেল থেকে ছেড়ে দিলেন। ভেবেছিলেন, ওরা নিজেরাই কাজিয়া করে মরবে। কিন্তু উল্টো হলো। দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম লীগের ধ্বজাধারীরা ইসলামিক বাংলাদেশের জিগির তুলল। আর বামপন্থীরা তুলল বিপ্লবের স্লোগান।

বামপন্থীদের মধ্যে আবার বেশি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি। এর তিন নেতা মেজর জলিল, আবদুর রব এবং

শাজাহান সিরাজ ছাড়া পেয়েই জিয়ার বিরুদ্ধে লাগল। অবশ্য ভারত এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের প্রচারও বন্ধ হলো না। তারাও চায় নির্বাচন। এককথায়, তারাও ক্ষমতা চায়। ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি বা এন. এস. পি. আরও একটু এগিয়ে গেল। তারা গণফৌজের স্লোগান তুলে সাধারণ সৈন্য-সেপাইদের উসকাতে লাগল। বলতে থাকল : তোমাদের জন্যই তো জিয়া ক্ষমতা পেয়েছে। কিন্তু তোমরা কী পেলে? এসব কথা মনে ধরল সেপাইদের। বিশেষ করে এন. এস. পি-র বেশিরভাগ নেতাই প্রাক্তন সেনাবাহিনীর লোক বলে একটা প্রভাবও ছিল তাদের উপর। কর্নেল আবু তাহের নামে এন. এস. পি-র এক প্রাক্তন নেতা তো সেনাবাহিনীর মধ্যে দলের ঘাঁটি করার জন্য অনেক দিন ধরেই কাজ করে যাচ্ছিল।

জিয়ার অসহ্য হলো এ-সব। ছেড়ে দেওয়ার বারদিনের মধ্যেই ফের জেলে পুরে দিলেন এন. এস. পি নেতাদের। এই সুযোগে একটু খাতিরও দেখাতে লাগলেন দক্ষিণপন্থীদের প্রতি। তিনি আর একটা কাজ করেন। অবাঙালিরা এতদিন প্রায় অস্পৃশ্য হয়ে ছিল বাংলাদেশে। তাদের তিনি ডেকে নিলেন কাছে। এরপর জিয়ার সামনে রইল কেবল বিপরীতপন্থী দুই দুশমন– মুজিবপন্থীরা আর এন. এস. পি।

বাংলাদেশের রাজনীতির একটা বিচিত্র চরিত্র আছে। অধিকাংশ দলেরই কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে বিদেশের প্ররোচনা। পাকিস্তান, চীন এবং আমেরিকা এদের প্রত্যেকেই চায় ডামাডোলের মধ্য থেকে ফায়দা ওঠাতে। লক্ষণীয় এর একটি দেশও কিন্তু সার্বভৌম বাংলাদেশকে প্রথমে স্বীকৃতি দেয়নি। একাত্তরের মার্চে ঢাকার প্রতি বাড়ির উপরে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে, বিদেশি দূতাবাসগুলিও উড্ডীন করল সেই পতাকা। বাদ কেবল চীন। চীন তখনো বিরোধী শিবিরে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সে ছিল পাকিস্তানের মিত্র। মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় একটা জাতি মুক্তিযুদ্ধ করছে, এটা চীনাতত্ত্বের কাছে অসহ্য। তার উপর রাজনৈতিক এবং সামরিক কারণেও পাকিস্তানকে সে ছাড়তে পারে না। ভারত এবং রাশিয়ার ভিতরকার খবর সংগ্রহের একটা চমৎকার মাধ্যম তার পাকিস্তান।

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে চীন কেবল যে পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে তাই নয়, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এইচ. ল্যামব-এর সংগৃহীত তথ্য হলো, চীন এক সময় নিজেই পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে নেমে পড়বে ভেবেছিল। বাংলাদেশের এই যুদ্ধটা যে মুক্তিযুদ্ধ সেটাই চীন অস্বীকার করে। তার বক্তব্য, ভারত আর রাশিয়ার মদদ পেয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দেশের মধ্যে হাঙ্গামা করছে। আর সেই চীন, মুজিব খুন হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

দেয়! মুজিব চেষ্টা করেও চার বছরের মধ্যে যা করতে পারেননি সেই উভয় দেশের দূত বিনিময়ও ঘটল তাঁর হত্যার পাঁচ সপ্তাহের মাথায়।

সমভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ মুজিবের মৃত্যুতে পাকিস্তানের স্বস্তিবোধ। 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' বলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের চটপট স্বীকৃতিদান, বাংলাদেশ সম্পর্কে সৌদি আরবের উৎসাহ প্রভৃতি বিসদৃশভাবেই প্রকট হতে থাকে। পাকিস্তানের সঙ্গে দূত বিনিময়ের প্রশ্নে আগেই দু' দেশ রাজি হয়ে যায়। কেউ হয়ত এতে বলবেন, শেষপর্যন্ত ভুট্টোরই জয় হলো। দু' দেশের মধ্যে বিভেদের পর্দাটা সরিয়ে ফেলার জন্য কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ভুট্টোই তাঁর ঢাকা সফরকালে মুজিবকে অনুরোধ করেন। মুজিব তাতে রাজি হননি তখন। এখন হঠাৎ তা হয়ে গেল।

আমেরিকার স্বীকৃতি আসতেও আর দেরি হলো না। জিয়া ক্ষমতায় আসার দু' সপ্তাহ যেতে না যেতেই ফোর্ড-এর কাছ থেকে সমর্থন এলো, এলো সবরকম সাহায্যের আশ্বাস। পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চীনও জিয়ার প্রশংসা করল। তা হলে এই ত্রয়ী শক্তির মধ্যে জিয়ার আসল স্রষ্টা কে? এখনো সেটা পরিষ্কার হয়নি। তবে সবচাইতে যেটা পরিষ্কার তা হলো– জিয়া এসেছেন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে। এবং এজন্য ভিতরের বা বাইরের যে-কোনো সাহায্য দরকার, নির্দ্বিধায় তা তিনি নেবেন। বাংলাদেশের নেতৃত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওই তিনটি দেশের কারো তেমন আগ্রহ নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ভারত এবং রাশিয়া থেকে বাংলাদেশকে দূরে রাখা। আর সেই উদ্দেশ্যেই তারা সেখানে জিইয়ে রাখবে সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পকে।

১৪

উনিশ শ' সাতাত্তরের এপ্রিলে জিয়া যখন একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দ্বৈত শক্তিধররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকা, যশোর, চট্টগ্রাম, বগুড়া এবং ময়নামতি ক্যান্টমেন্টে ব্রিগেডিয়ার আর মেজর জেনারেলদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাদের প্রশ্ন, ওই দুটি পদই কেন একই ব্যক্তি আগলে থাকবেন? ওর একটি ছাড়তে হবে জিয়াকে। এ নিয়ে জিয়া-অনুগামী বনাম জিয়া-বিরোধীদের মধ্যে ক্যান্টনমেন্টগুলিতে নিয়মিত সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। পরিণামে কিছু সেনা-অফিসারের কোর্টমার্শাল হয় : চাকরি ছেড়ে যেতে হয় আর কিছুকে। এ-সময় ঢাকায় খবর আসতে থাকে যে, সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টের আশপাশের লোকালয়ে গিয়ে লুঠতরাজ নারী নির্যাতন প্রভৃতি সব রকম অত্যাচার চালাচ্ছে, ঠিক পাকিস্তানি-পাঞ্জাবি সৈন্যরা যেমন করতো।

সৈন্যদের মধ্যে অনেকদিন থেকেই বেতনবৃদ্ধির একটা দাবি ছিল। তা তো পূরণ হয়ই-নি, এমনকি নিয়মিত বেতনও তারা পাচ্ছিল না। সরকারের কোষাগার তখন শূন্যপ্রায়। এই অনিয়মিত বেতনের ফলে জিয়ার নিজের জেলা বগুড়াতেই সেনা-ছাউনিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ ঘটনা সাতাত্তরের সেপ্টেম্বরের শেষদিককার। ঢাকা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এসময় হঠাৎ একটি ছিনতাই করা জাপানি বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তখন দেশের তথা প্রশাসনের দৃষ্টি এই ব্যাপারটার দিকে নিবদ্ধ থাকার সুযোগ নিয়ে কিছু সেনানায়ক এক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে। তাদের লক্ষ্য ছিল জিয়ার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া। কিন্তু ব্যর্থ হয় সে অভ্যুত্থান। ওই সময় ঢাকা এবং বগুড়ায় জিয়ার সমর্থক বনাম জিয়া বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষে সহস্রাধিক ফৌজের প্রাণ যায়। এই ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের বেশিরভাগকেই ঝুলতে হয় ফাঁসির রজ্জুতে।

আর একটা কারণে গভীর জলে পড়লেন জিয়া। তাঁর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তবে তখন যা পরিস্থিতি তাতে কমান্ডার-ইন-চীফ-এর পদ ছেড়ে

দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল এরশাদ, বাংলাদেশ রাইফেলস-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর মেজর জেনারেল কাজী গোলাম দস্তগীর এবং নবম ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল মীর শওকত– এরা তিনজনই ছিল ওই পদের দাবিদার। মীর শওকতের সঙ্গে জিয়ার সম্পর্কটা তেমন ভালো ছিল না কিছুদিন। তাকে চট্টগ্রামে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে তা অগ্রাহ্য করে। যে-কোনো কারণেই হোক জিয়া এ-নিয়ে আর এগোয়নি। ইতোমধ্যে বিদ্রোহীরা জ্বলে ওঠে। মীর শওকত তাদের অল্প সময়ের মধ্যে শায়েস্তা করল। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সে তেজগাঁও বিমানবন্দরে ট্যাঙ্ক ও সৈন্যবাহিনী পাঠায়। বলতে গেলে শওকতের তৎপরতায় দরুনই জিয়া সেবার রক্ষা পেলেন। এর ফলে কমান্ডার-ইন-চীফ এর পদে তার দাবিটা হলো জোরদার। কিন্তু জিয়া কাউকে বিশ্বাস করার পাত্র নন। অমন ক্ষমতাপূর্ণ পদে কাউকে একবার বসতে দিলে পরে সে তো জিয়ার গদিটিও দখল করতে চাইতে পারে! সুতরাং তা না করে তিনি পাঁচজন ব্রিগেডিয়ারকে পদোন্নতি ঘটিয়ে মেজর জেনারেল করলেন। নবম ডিভিশন আর স্পেশাল পুলিশ ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। এ-ভাবে গদিটাকে খানিক নির্ঝঞ্ঝাট করে নিলেন জিয়া।

বগুড়ার ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি কিছুটা জড়িত ছিল। কিন্তু ঢাকায় যা ঘটে তা সম্পূর্ণ সেনাবিক্ষোভ। বগুড়ায় বিক্ষোভকারীদের স্লোগান ছিল 'খোন্দকার মোস্তাক জিন্দাবাদ'। স্লোগান শোনা গেল ফারুকের নামেও। কিন্তু ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, বিমানবন্দর এমন কি বাংলাদেশ রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র থেকেও কোনো রাজনৈতিক স্লোগান শোনা গেল না। রাজনৈতিক দলগুলিকে বরং দেখা গেল এই বিদ্রোহের নিন্দা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিচ্ছে। নিন্দা করে মিছিল পর্যন্ত বেরোল রাস্তায়। জিয়া অবশ্য অনুগত ফৌজদের নিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেতার কেন্দ্রের পুর্নদখল নেন। বেলা বারোটা নাগাদ জিয়া রেডিও স্টেশনে এলেন। জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে 'কিছু হতাশ লোক' এই বিদ্রোহের চেষ্টা করে। তবে তারা ব্যর্থ হয়। অনুগত সৈন্যবাহিনী সফলভাবে সে বিদ্রোহ দমন করেছে। সাত মিনিটের এই বেতারভাষণে তিনি আরও বলেন 'এই বিদ্রোহটা এমন সময় দেখানো হলো যখন দেশ চলেছে 'শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে।'

এই ক্ষণস্থায়ী অভ্যুত্থানে বিমানবাহিনীর এগারজন অফিসারসহ কম করেও শতাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারায়।

ক্ষমতার লড়াইটা এবার মোড় নেয় ভিন্ন দিকে। দুই অক্টোবরের বিদ্রোহের পিছনে ছিল যৌথ নেতৃত্ব। ছিয়াত্তর সাল থেকেই জিয়ার সঙ্গে অপর চারজন মেজর জেনারেলের সম্পর্ক ভালো চলছিল না। সাতাত্তরে জিয়া যখন সংবিধান থেকে 'ধর্ম নিরপেক্ষতা' বাদ দেন তখন এই ফাটলটা বেশ বড়ো হয়ে যায়। অবস্থার আরো অবনতি ঘটে পাকিস্তান প্রত্যাগত মিলিটারি অফিসার ও সি. এস. পি. অফিসারদের 'ইসলাম' এর জিগির তুলে উন্মত্ত অত্যাচারে। জনসাধারণ অসন্তুষ্ট। ক্ষোভের চাপা আগুন সর্বত্র। জিয়ার প্রতিপক্ষরা সংঘবদ্ধ হয়ে সাতটি জেলার সব জায়গায় প্রশাসনকে অগ্রাহ্য করতে থাকে। তারা ঘোষণা করল– জিয়াকে যতোদিনে না সরাতে পারে তারা লড়ে যাবে।

সাতাত্তরের অক্টোবর-অভ্যুত্থান এক সপ্তাহের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সিপাই এবং অফিসার মিলে গ্রেফতার হয় কয়েক শত। সামরিক আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ড হয় অনেকের।

তবে এতে জিয়ার হাত যে শক্ত হলো, তা নয়। বরং এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি আর তাঁর বুদ্ধিদাতারা। বগুড়ার অভ্যুত্থানকে দ্রুত মোকাবিলা করতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার। শহরটা চলে যায় বিদ্রোহীদের হাতে। রাত্রের দিকে কেবল সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয় তাদের। সকালে বগুড়া জেলের দরজা খুলে দেয় বিদ্রোহীরা। বন্দিরা সব বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও জে. এস. ডি. বা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের স্থানীয় নেতারাও ছিল। দোকান-পাট ভেঙে, ব্যাংক লুট করে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয় বিদ্রোহী সৈন্যরা। তারা স্লোগান দেয়, 'আমাদের দাবি মানতে হবে, এ লড়াই বাঁচার লড়াই, অত্যাচারী খতম হোক।'

বিদ্রোহ দমন করতে সেনাবাহিনী বগুড়ায় পৌঁছায় আটচল্লিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর। যখন উত্তর রংপুরে একাদশ ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার এবং যশোরেও আর এক ডিভিশন সৈন্য রয়েছে তখন বগুড়ায় সৈন্য পাঠাতে এই দেরির কোনো স্বাভাবিক যুক্তি থাকতে পারে না।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছিল, বগুড়ার বিদ্রোহটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর শাখা প্রশাখা অন্যত্র প্রসারিত। বিদ্রোহীরা তাই এই ঘটনার পরেও বিনা শাস্তিতে নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোরাফেরা করতে থাকে। পরিষ্কার বোঝা যায়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপরের স্তর থেকে এদের প্রতি সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন আসছিল। এই প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার উল্লেখ্য। বিদ্রোহীরা

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ার চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাদের দমন করতে পুলিশ নামানো হয়। এটা এক অদ্ভুত কাণ্ড। সশস্ত্র বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে মুষ্টিমেয় পুলিশ প্রাণ দেওয়া ছাড়া কী করতে পারে? সব জেনে শুনেই ঢাকার কর্তৃপক্ষ এই কাণ্ডের নির্দেশ দেয়। এর একটা জবাব হতে পারে যে, হাতের কাছে নগদ আর কিছু ছিল না। কিন্তু হেলিকপ্টার, বিমান, ট্যাঙ্ক কী না ছিল ঢাকায়? সেগুলি কেন পাঠানো হলো না?

যশোর এবং রংপুরের ডিভিশন হয়তো যে-কোনো কারণেই হোক পাঠানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঢাকা এবং টাঙ্গাইলেও তো সৈন্য ডিভিশন ছিল। যমুনার ওপারেই সেনা-ছাউনি। আটচল্লিশ ঘণ্টার আগেই সেখান থেকে সেনাবাহিনী পৌঁছতে পারে। তবু ঢাকার এক ডিভিশন এবং টাঙ্গাইলের তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকল। কেন? কেউ কেউ বলে বিদ্রোহীরা নদী পারাপারের প্রতিটি ঘাঁটিতে বিমান-বিধ্বংসী রিকয়েললেস গান নিয়ে এমনভাবে মোতায়েন ছিল যে সৈন্য ডিভিশনের পক্ষে নদী পেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।

আর-এক সূত্র বলছে অন্য কথা। বগুড়া ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ বেশ-কিছু অফিসারসহ বিদ্রোহীদের বেড়াজালে পড়ে যায়। চতুর্থ লাইট হর্স রেজিমেন্টের কর্নেল মাহবুব ইলাহিরও একই দশা। এই অবস্থায় সরকার দেখল, মারাত্মক কোনো আক্রমণ চালাতে গেলে ওদের জীবনও বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। এ জন্য উভয় সংকটে পড়েন জিয়া।

দুই অক্টোবর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকেই বগুড়ার ভীত-সন্ত্রস্ত নরনারী পালাতে শুরু করে। সীমান্ত অতিক্রম-করা উদ্বাস্তুরা বলতে লাগল, বগুড়া পুরো বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছে। তাদের দমন করা দূরে থাক, বরং ক্রমাগত তারা ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের শক্তি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ আর জে. এস. ডি-র কর্মীরা এসে। উদ্বাস্তুদের আরও খবর : বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকেরই ইউনির্ফমে কাঁধের পাশে এমব্রয়ডারি করা আড়াআড়ি তলোয়ার চিহ্ন রয়েছে। উল্লেখ্য, ওই চিহ্নটি হলো রংপুর ছাউনির একাদশ ডিভিশনের সৈন্যদের প্রতীক। উদ্বাস্তুদের চোখে দেখা খবর সত্য হলে, এটা পরিষ্কার যে, লে. কর্নেল খালেকউজ্জমানের অধীনস্থ স্বাবিংশতিতম বেঙ্গল রেজিমেন্টও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। উত্তরাঞ্চলের ডিভিশনাল কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার লতিফও ওদের পিছন থেকে মদদ দেয়। দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া এবং পাবনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এ-ভাবে বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়।

যশোরে যে পঞ্চান্নতম ডিভিশন ছিল, তাদের ওই সময়কার ভূমিকাও বিশেষ নির্ভরযোগ্য মনে হয়নি সরকারের কাছে। তারা বিদ্রোহে যোগ দেয়নি বটে, কিন্তু কোনো উৎসাহও দেখায়নি বিদ্রোহ দমনে। তা না হলে তারা অন্তত ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়তো, উদ্ধার করতো কিছু এলাকা বিদ্রোহীদের দখল থেকে।

সীমান্তরক্ষীবাহিনী রইল নীরব দর্শক হয়ে। ঢাকা থেকে যদি নদী অতিক্রম করে আক্রমণ চালানো হয় সেই আশঙ্কায় যমুনার তীর বরাবর প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলে বিদ্রোহীরা। এপার থেকে গোলাবর্ষণ আর উপর থেকে বিমান আক্রমণ ছাড়া তখন বিদ্রোহীদের ঘায়েল করা ছিল অসম্ভব।

বগুড়ার বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল ঢাকায়। এক এবং দুই অক্টোবর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও সাভারের সামরিক ছাউনিতে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ হয়। অফিসার ও সিপাই মিলে প্রায় পঞ্চাশজন তাতে প্রাণ হারায়। আহত হয় শতাধিক। পয়লা অক্টোবর রাতে জিয়া নিজেই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে কন্ট্রোল-রুম থেকে চতুর্দিকে সীমান্তরক্ষীবাহিনী ও তাঁর অনুগত সৈন্যদের নির্দেশ দিতে থাকেন। বহু জেলা হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ঢাকার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুই অক্টোবর সকালবেলা প্রায় একশত বিদ্রোহীর একটি দল ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে অস্ত্রাগারে হানা দেয়। বিমানবন্দরে তখন ছিনতাই করা সেই অভিশপ্ত জাপানি বিমানটি। কন্ট্রোল টাওয়ারে তখন তাই নিয়ে ব্যস্ততা, উদ্বেগ। ছিনতাইকারিদের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। এই সুযোগে বিমানবন্দরটি সহজেই বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। তিনজন অ্যাডজুট্যান্ট নিহত হয় ওদের হাতে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান এম. জি. মাসুদ কোনোক্রমে ওদের হাত থেকে রেহাই পায়। ওদের হাত থেকে বিমানবন্দর মুক্ত হয় শেষ পর্যন্ত।

বিদ্রোহীদের আর একটি দল দখল নেয় ঢাকা বেতার কেন্দ্রের। বেতারে অজ্ঞাত কণ্ঠ ভেসে এলো : 'গণফৌজের তরফ থেকে ঘোষণা হচ্ছে– সেনাবাহিনী, ছাত্র-কৃষকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তুত থাকুন।'

এই অবস্থায় জিয়া ফের বঙ্গভবন ছেড়ে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নেন। কারণ বহু অফিসারের প্রাণদণ্ডে ঢাকা তখন গর্জে উঠেছে বিক্ষোভে। জনগণ হয়ে উঠেছে ক্রুদ্ধ এবং বিদ্রোহী।

ফাঁপড়ে পড়ে অন্য পথ ধরলেন জিয়া। রাজনৈতিক দলনেতাদের ডাকলেন এক বৈঠকে। বললেন, বিদ্রোহীরা বিদেশি শক্তির দালাল। এ

অবস্থায় দেশপ্রেমিকদের এগিয়ে আসা উচিত। তিনি তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা চান। সুযোগ পেয়ে জাতীয়তাবাদী নেতারা বললেন : ঠিক আছে, সহযোগিতা পেতে হলে আগে নিপীড়ন বন্ধ করুন, ফিরিয়ে দিন গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি। জিয়া ব্যাজার হলেন শুনে। বুঝলেন, এ পথেও হবে না। সেই দিনই তিনি বঙ্গভবনে বৈঠকে বসলেন দুটি আরব রাজ্যের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। আলোচনা চলে বেশ কয়েক ঘণ্টা।

সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে বাগাতে জিয়া রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠকে সেই পাকিস্তানি ঢঙে ভারতবিরোধী বিষোদগার করে যান। বেতার বক্তৃতা দিলেন, তাও ওই ঘ্যান-ঘ্যানানি। বিরক্ত হয়ে ভারত সরকার দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনার শামসুর রহমানকে ডেকে বেশ কড়া ভাষায় বলে দেন, ভারত এসব বরদাস্ত করবে না।

জিয়াও অবশ্য আর ভারতবিরোধী জেহাদ চালাতে পা বাড়াননি। তবে দেশবাসীর কাছে নিজের ভাবমূর্তিটা মানানসই করে নিতে আর একটা জবর বেতার ভাষণ দিলেন। তারিখ– তিন অক্টোবর, উনিশ শ' সাতাত্তর।

এতে তিনি বগুড়ার বিদ্রোহীদের নিন্দা করেন, এর ফলে যে বহু লোকের প্রাণ গেল তাঁদের জন্য দুঃখ জানালেন। তাঁর খেদ, যখন সশস্ত্র বাহিনীর অনেক বঞ্চনা ও অবহেলা দূর করে দেশ তাদের সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত করতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই এই বাধাটার সৃষ্টি হয়।

জিয়া বলেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং দেশ রক্ষার জন্য সামরিক শক্তিকে সুসংগঠিত করার প্রয়াস অনেকের মনঃপুত নয়। তারা আমাদের রাখতে চায় তাদের আশ্রিত, তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে। কিন্তু আমরা তা হতে দেবো না।

দেশের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে, দলমত নির্বিশেষে আপনারা সকলেই রাষ্ট্রবিরোধী কাজের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। দোষীদের কঠোর শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দাবি করেছেন। সেনাবাহিনীর মধ্যেও একই মনোভাব রয়েছে। রাজনৈতিক নেতারাও বলছেন রাষ্ট্রদ্রোহীদের শক্ত হাতে শায়েস্তা করতে। আমরা অপরাধীদের খুঁজে বার করছি। শাস্তি তারা পাবেই। মৃত্যুদণ্ড দিতেও কসুর করা হবে না।

জিয়া জানান, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সরকারের কাজে তিনি চান জনসাধারণের সহযোগিতা। খাদ্যোৎপাদন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, স্থানীয় প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি জনগণের সহযোগিতা আশা করেন। জাতীয় জীবনের এই সংকটকালে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, শান্তিভঙ্গের চেষ্টা কিছুতেই সহ্য করা হবে না।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বলেন : আমি আবার পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই, বাংলাদেশি জাতীয়তাই হবে বাংলাদেশের রাজনীতির একমাত্র ভিত্তি। আমাদের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলনই হবে এখানকার রাজনীতির লক্ষ্য।

জনগণের নামে আরব্ধ কার্যক্রম অবশ্যই সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হবে। যে কাজ সাধারণের কাছে প্রকাশ করা যায় না, সে কাজ কখনো জনগণের কল্যাণ করতে পারে না।

এর পর তিনি ঘোষণা করেন, রাজনীতির মধ্য দিয়ে দেশে সন্ত্রাসবাদ, বৈদেশিক অনুপ্রবেশ এবং ষড়যন্ত্র যাতে না চলে তার জন্য, দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে কয়েকটি দলকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দলগুলি হলো, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, মণি সিং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ডেমোক্র্যাটিক লীগ। তবে ওই সব দলের কেউ যদি হিংসার পথ ত্যাগ করে জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চান বা গঠনাত্মক রাজনীতির পথ নেন তা হলে তাঁরা সে সুযোগ পাবেন।

তিনি বলেন, দেশ এক বিরাট সংকট কাটিয়ে উঠল। জাতি যে আজ কতো ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত তা সে এই সংকট মোকাবিলার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে। সে দেখিয়ে দিয়েছে দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য গোটা জাতি আজ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। যে-কোনো স্বাধীনতাপ্রেমী জাতির পক্ষে এ এক পরম গৌরব।

শেষে বললেন জিয়া : আল্লাহ-তালার কাছে এবাদত করি, আমাদের এই ঐক্য যেন অটুট থাকে, সংকল্প যেন দৃঢ় থাকে। সমৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রের পথে আমাদের এই যাত্রায় খোদা যেন দোয়া করেন। বিসমিল্লাহ-এ রহিম বলে উপসংহার হলো ভাষণের।

১৫

জিয়া আর তাঁর জঙ্গী জুন্টার প্রধান উদ্বেগের কারণ : বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব। জিয়া জানেন, আওয়ামীর জনপ্রিয়তা কত গভীর, কত ব্যাপক। তাই তাদের অনেক নেতাকে, অসংখ্য কর্মীকে কারাগারে রেখেও স্বস্তি নেই জঙ্গী জুন্টার।

কিছুদিন হলো, ঢাকায় ধানমণ্ডির সাত নম্বর মসজিদ স্ট্রিটে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সংগঠন কমিটির এক গোপন বৈঠক হয়। তাতে সভানেত্রীত্ব করেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেয়া হয় সেখানে। দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে জুন্টার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এক প্রস্তাবে বলা হয় : কমিটি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, অগণতান্ত্রিক জঙ্গী শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর দেশে এক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এক নিরলস চেষ্টা চলছে আমাদের ইতিহাস এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে বিকৃত করতে। কমিটির বিশ্বাস, এগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন চেষ্টা নয়। এসব এক পরিকল্পিত হীন চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ। জাতিকে সদা-সতর্ক থাকতে হবে একে প্রতিরোধ করতে। দেশের গণতান্ত্রিক, স্বাধীনতাকামী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং আওয়ামী লীগের পেছনে সঙ্ঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছে এই কমিটি। ...সম্প্রতি জনৈক মুসলিম লীগ নেতা এক দাবি তুলে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছে যে, অবিভক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের বদলে বিভক্ত, পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র চাই। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক ও জাতীয়তা-বিরোধী দাবির তীব্র নিন্দা করছে এই কমিটি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও প্রতিক্রিয়ার দালালদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক শক্তি দীর্ঘ আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিভেদনীতির অবসান ঘটিয়ে এই একক নির্বাচন কেন্দ্রের নীতি কায়েম করে। কিছুতেই তা ভেঙে দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না।

...এই কমিটি দাবি করছে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে। দিতে হবে প্রকাশ্য রাজনীতিক জীবনের অধিকার। নিয়ন্ত্রিত সভা-সমাবেশ নয়। চাই সভা-

সমাবেশ-শোভাযাত্রার পূর্ণ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। চাই ইমার্জেন্সি, বিশেষ ক্ষমতা, সামরিক আইন প্রভৃতি কালা কানুন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক বিধান।

ওই প্রস্তাবে অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্যমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিম্ন-আয়ের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পুনর্বিন্যাস করা, গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির প্রবর্তন ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করা হয়।

একটা কথা আগেই বলেছি, বাংলাদেশের মানুষ গত আঠাশ মাস ধরে পাকিস্তানপন্থী অফিসারদের নির্বিচার নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু তারও সীমা আছে একটা। তাদের সেই অসহনীয় ক্ষোভের প্রকাশ দেখা গেল আটাত্তরের ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসে। এদিন প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক কবিতাগ্রন্থ 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়?'– নামে। ত্রিশটি কবিতা। দাম দু'টাকা। এর প্রত্যেকটি কবিতা যেন এক একটি আগুনের মশাল। একুশে ফেব্রুয়ারির অগ্নিবাণ–এই বই বাজেয়াপ্ত করলেন জিয়া। নিষিদ্ধ হলো এর প্রচার। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে এর প্রচার গেল বেড়ে, চাহিদা হলো প্রচণ্ড। দু' টাকার বই লোকে কিনল একশ' টাকা দিয়ে। কবিতাগুলি জঙ্গীশাসনের প্রতি ধিক্কারে পূর্ণ আর মুজিবের প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধায় ছন্দিত।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলেই বাংলাদেশের এই অনিশ্চয়তা দূর হবে, এমন কথা কেউ বলতে পারে না। কোনো সরকারই এখানকার সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। এখানে উন্নয়নমূলক কাজের ছিয়াশি শতাংশ সাহায্যই আসছে বিদেশ থেকে। কোত্থেকে আসবে এদের আত্মনির্ভরতা? জনসংখ্যা-বৃদ্ধির বিস্ফোরক অবস্থা। তার উপর আবার একজনের একাধিক বিবি। দেশ চলছে শরিয়তি বিধি মতে।

সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও এটা প্রমাণ হলো যে, সেনাবাহিনীর 'পরে শিথিল হয়ে গেছে জিয়ার প্রভাব। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অদল-বদল ঘটিয়েছেন কিন্তু তাতে সংকট দূর হয়নি, ক্ষোভ বরং ছড়িয়েছে।

তবে এটা ঠিক, স্বেচ্ছায় জিয়া ক্ষমতা ছাড়বেন না। আয়ুব খাঁকে যেমন সরানো হয়েছে, তেমনি যদি বলপ্রয়োগে সরানো সম্ভব হয়, সে স্বতন্ত্র কথা।

জিয়ার মুখে সর্বদাই ভারতের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের বুলি, কাজে সবই উল্টো। গত ডিসেম্বরে ভারতে তার সরকারি সফরের সময়ও তিনি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ভারতের প্রতি অবিশ্বাস ছাড়া আর কোনো মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া গেল না তাঁর।

একটা বড় প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের আট কোটি মানুষের নেতৃত্ব দেবে কে? সানুচর জিয়া, না আওয়ামী লীগ? আওয়ামীর নেতাদের দাবি, গত বছর যুক্ত পরিষদ ও পুর-নির্বাচনে এই দল শতকরা পঁচানব্বইটি আসন দখল করেছে। সুতরাং তাঁরাই জনগণের অবিসংবাদী প্রতিনিধি। অপরদিকে জিয়ার পেছনে সামরিক বাহিনীর দশ সহস্র অনুগত ফৌজ। অবশ্য তাদের আনুগত্য কতটা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ব্যারাকে ব্যারাকে সংঘর্ষ প্রায় এখন স্বাভাবিক ব্যাপার।

ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস এখনো পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারছেন না। বর্তমান হাইকমিশনার কে.পি.এ. মেননের অভিমত, আওয়ামী লীগ এখন নেতৃহীন, সুগঠিত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। প্রথমসারির নেতারা নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। সেই শূন্যতা পূর্ণ হতে পারে জিয়াকে দিয়ে।

কিন্তু জিয়ার এই শক্তির উৎস কোথায়? বাইরে থেকে মেগে-আনা কিছু অস্ত্রপাতি আর কয়েকটি ট্যাঙ্ক? বর্তমান ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারা সংগ্রাম করছে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। স্বাভাবিকভাবেই তারা সর্বত্র গণতন্ত্রের পক্ষে থাকবে। তারা কী করে সমর্থন করবে বাংলাদেশের জঙ্গী জুন্টাকে? দিল্লির সাউথ ব্লক অর্থাৎ বিদেশ দফতর যদি ভেবে থাকে ঢাকার জঙ্গী নেতাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দিনকে দিন ভালো হতে থাকবে, তা হলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের কর্মীদের উপর কড়া নজর রাখা হয়। কূটনৈতিক সৌজন্যটুকুও ওরা মানে না। সমর সেনকে গুলি করা হলো। দূতাবাসের ফোন পর্যন্ত আটকে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করেও কাজ হয় না। ভারতীয় হাইকমিশনের কোনো পার্টিতে যেতে দেওয়া হয় না ঢাকার কোনো সাংবাদিককে। আর যদি কেউ যায় তাকে নির্যাতন ভোগ করতে হয় থানা-পুলিশ, এমনকি সামরিক লোকদের হাতেও।

আরও আছে। গত আঠাশ মাসে অন্তত তিনজন ভারতীয় দূতাবাস-অফিসারকে ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। ভারত সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু নিষ্ফল।

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক নেতাদের ধারণা, ভারত-বিরোধী এবং হিন্দু-বিরোধী জেহাদ চালাতে পারলেই তারা গদিতে থাকতে পারবে। আয়ুবও সে পথ পরখ করে দেখেছেন কিন্তু গদি তাতে রক্ষা পায়নি তাঁর। ইতিহাসের শিক্ষা না নিলে, একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। বাংলাদেশের নেতাদের মনে রাখা দরকার যে, তাদের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নর-নারীর দায়ভার

আর কেউ নয়, তাদেরই বহন করতে হবে। বর্তমান যা হাল, তাতে বিশ্বের যে-কোনো দেশের পক্ষেই বাংলাদেশ এক বোঝা বলে বিবেচিত হবে।

ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনের অফিসার ও কর্মচারীদের বিগত আঠাশ মাস ধরে ঢাকায় কার্যত বন্দি জীবন যাপন করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার সাতকাহন গাওনা করতে পারে, কিন্তু কী যুক্তি তাদের আছে অশোক গুপ্ত, ব্রিগেডিয়ার ভোরা এবং শ্যামল মল্লিককে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে বার করে দেওয়ার?

বিগত কংগ্রেস শাসনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না। খবর ছাপায় বাধা-নিষেধ ছিল সরকারি। তাই বাংলাদেশ থেকে ভারতের দু'জন কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে বিতাড়নের খবর জানতে পারেনি ভারতের সাধারণ মানুষ। তবু শ্যামল মল্লিকের বহিষ্কারের কথা গোপন রাখতে পারেনি সাউথ ব্লক। তবে কেন, কী কারণে ওরা এ সাহস পেল তা সাধারণ লোক প্রশ্ন তুলতে পারে। ভারত কেন বদলা নিল না? সাধারণ নিয়ম হলো পত্রপাঠ ওদের কূটনৈতিক লোককেও এখান থেকে বার করে দেওয়া। তা না করে ভারত অপমান মাথা পেতে নিল। অথচ কলকাতা এবং দিল্লিতে বাংলাদেশ মিশন যাদের রেখেছে এবং যারা বেশ নির্বিবাদে চড়ে বেড়াচ্ছে তাদের মধ্যে অন্তত আধ-ডজন অফিসার হলো প্রাক্তন পাক-গোয়েন্দা বিভাগের লোক। বাকিরা বাংলাদেশ সামরিক গোয়েন্দা শাখার। তারা বেশ তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোপ মারছে। এ থেকে বলা চলে, বাংলাদেশের কাছে ভারত কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে।

দিল্লির সাউথ ব্লকের ধারণা জিয়াউর রহমান কম ক্ষতিকারক। তিনি না থাকলেই বরং অবস্থার অবনতি ঘটবে। কিন্তু ভুল তাদের হিসাব। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় নেই বলে ভারত অকূল পাথারে পড়েনি। বরং ভালোই চলছে আরো। তেমনি, জিয়া গদিতে না থাকলেও বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে না। এবং তার বদলে যাঁরা আসছেন, তাঁরা হয়তো ডিক্টেটরি বরদাস্ত করবেন না। আওয়ামী লীগের নেতারা ধর্ম-নিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এই কথাটা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। তবে সবার উপরে একটি ভাবনা থেকেই যায় : বাংলাদেশ কি আর কোনোদিন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে? হলে কী উপায়ে? গণতান্ত্রিক দুনিয়াকে অপেক্ষা করতে হবে এর উত্তর পেতে। তবে সে প্রতীক্ষা কত দীর্ঘ হবে জানি না।

শেষ অধ্যায়

ডেটলাইন মুজিবনগর

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ নিয়েছিল মুজিবনগরে। এই মুজিবনগর পৃথিবীর কোনো মানচিত্রে নেই। থাকার কথাও নয়। মুজিবনগর নামের জন্মকাহিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ঘটনাবলীর চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। এবার আসল ঘটনাটা বলি।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে। শপথ নেওয়ার পর তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করলেন, 'এই জায়গাটার নাম দেবেন না। তাহলে খানসেনারা কালই এই অঞ্চলে হামলা চালাবে।' অনুষ্ঠান শেষে অফিসে ফিরে 'আনন্দবাজার'-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষকে জানালাম তাজউদ্দীনের এই অনুরোধের কথা। তিনি আমায় কপি লিখতে বলে নিজেও বসে পড়লেন কাগজ-কলম নিয়ে। খানিকক্ষণ পরে তিনি এসে বললেন, 'লেখো, ডেটলাইন মুজিবনগর।' পরদিন 'আনন্দবাজার'-এর পাঠকরা দেখলেন এই নতুন জায়গার নাম। গোটা বিশ্বের সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'জায়গাটা কোথায়?' আমরা বলিনি। বস্তুত, এই বইটি লেখার আগে পর্যন্ত বলিনি। কিন্তু ঘটনাটির রেকর্ড রাখতে এবার বলতেই হল। মুজিবনগর কোনো মানচিত্রে নয়, ছিল বাংলাদেশের হৃদয়ে।

মুজিব হত্যার পর গোটা বিশ্ব যখন স্তম্ভিত, তখন গোটা বাংলাদেশে মার্শাল ল জারি করে খোন্দকার-জিয়া বাহিনী অত্যাচার, খুন, বাড়ি দখল, ধর্ষণ করে চলেছে একের পর এক। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ভারতের হাই কমিশনার সমর সেন তখন কলকাতায়। ঢাকার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তিনি ঢাকায় ফিরতে পারছেন না। তিন দিন পর তিনি সড়কপথে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তিনি পৌঁছুনোর আগেই আমি পেট্রাপোল সীমান্তে পৌঁছে যাই। হত্যার দিনই শেষরাতে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে খবর পৌঁছায়। ইন্দিরা গান্ধী ভ্রাতৃহত্যার খবর শুনে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন।

২নং সফদরজং রোডের বাড়িতে বাকি রাতটা পায়চারি করেন। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথা-বেদনায় তখন তিনি অন্য এক ইন্দিরা। শেষ রাতে তাঁর অস্থিরতা দেখে পাশের ঘর থেকে ছোট পুত্র সঞ্জয় গান্ধী ও পুত্রবধূ মানেকা বেরিয়ে আসেন। সঞ্জয় মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। মানেকা তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার ক'জন সদস্য, সামরিক বাহিনীর প্রধান শ্যাম মানেকশ, 'র', আই-বি-র প্রধানরাও এসে যান। তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এতদিন বাইরে আসেনি। '৭৭ সালে আমেথিতে নির্বাচন কভার করতে গিয়ে ইন্দিরার পুত্র সঞ্জয় ও মানেকার কাছে ঘটনাটির কথা শুনেছি। তাঁরাও ওই তথ্য প্রকাশ করতে মানা করেন। মানেকা গান্ধী বর্তমানে বিজেপির নরেন্দ্র মোদী সরকারের মন্ত্রী। বাজপেয়ীর আমলেও তিনি মন্ত্রী ছিলেন। আর, যখনকার কথা বলছি রাজীব ও সোনিয়া তখন দিল্লিতে ছিলেন না।

মানেকা আমাকে আরো বলেছিলেন, ইন্দিরা প্রথমে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভকে ফোন করেছিলেন। ফোন করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের। মন্ত্রীরা অনেকেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। ইন্দিরা তাঁদের বলেছিলেন, 'সমর সেনের রিপোর্ট আসার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' [সমর সেন গিয়ে সোজা খোন্দকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিগুলি আপনারা বাতিল করেছেন। তা প্রত্যাহার না করা হলে ভারত আপনাদের স্বীকৃতি দেবে না।' খোন্দকারের পাশে তখন ছিলেন জিয়া।

খোন্দকার-জিয়ারা বললেন, 'ইন্দিরা-মুজিবের যাবতীয় চুক্তি বজায় থাকবে। এই হত্যার ষড়যন্ত্র চলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই মুজিব হত্যার চক্রান্ত পাকা করেন। এই ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয় কলকাতার একটি বিদেশি দূতাবাসে, যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। শুধু মুজিব নয়, এদের হত্যা-তালিকায় ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর গোটা পরিবারও। মুজিবের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তখন জার্মানিতে। ইন্দিরা গান্ধী নিজে ফোন করে রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ওই দুজনকে হোটেল থেকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে। সেই নির্দেশমতো মুজিব-কন্যাদের সপরিবার তুলে নিয়ে আসা হয়। ইতোমধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভার ডেপুটি মিনিস্টার প্রণব মুখার্জিকে জার্মানিতে পাঠানো হলো এয়ারফোর্সের বিশেষ বিমানে। মুজিব-কন্যাদের নিয়ে রাখা হল নয়াদিল্লির পান্ডারা রোডের একটি বাড়িতে। সেই থেকেই প্রণববাবুর সঙ্গে মুজিব-কন্যাদের যোগাযোগ।

মুজিব হত্যার পর চার-পাঁচ দিন 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর'-এর মধ্যে খবর করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। 'আনন্দবাজার'-এর হয়ে একমাত্র আমিই খবর করতাম। বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব, 'র', আই-বি-র সমস্ত কাজই দেখতেন। ক'বছর আগেই তিনি মারা যান। তাঁর নাম শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিবারেশন সরকারের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একজন দক্ষ আইপিএস অফিসার হিসেবে শরদিন্দু বাবু ওপারে আটকে থাকা নেতাদের (তাজউদ্দীন, কামরুজ্জামান) দলবল নিয়ে এপারে নিয়ে আসেন। মুজিব-হত্যার পর কোনোভাবে তিনি তাজউদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। যুদ্ধের আগে আইএসআই-এর এক গোয়েন্দা অফিসার জিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। জিয়া তাঁকে তাজউদ্দীনকে গ্রেপ্তারের দায়িত্ব দেন। ভারত সীমান্তের কাছে সেই অফিসার তাজউদ্দীনকে গ্রেপ্তার করেন। ওই অফিসারকে জিয়া কয়েক লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে স্কলারশিপ দিয়ে অক্সফোর্ড পাঠান। তিনি পরে বিবিসির বাংলা বিভাগে চাকরি পান। সেখানে বসে তিনি আওয়ামী লীগ ও হাসিনার বিরুদ্ধে কলকাঠি নাড়তে শুরু করেন।

'৯৬ সালে হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে বিবিসি-কে এ কথা জানানোর পর ওই অফিসারকে সাময়িকভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়। শরদিন্দু বাবু আমাকে বলেছিলেন, বাংলাদেশ নিয়ে বেশিদিন আর লিখতে পারা যাবে না। তিনি বলেছিলেন, 'গতকাল রাতে ক্যালকাটা ক্লাবে বিদেশি রাষ্ট্রদূত কলকাতার কাগজে ঢাকার খবর বেশি না ছাপার জন্য অনুরোধ করেছেন। খবর আছে, কোপটা তোমার ওপরেই পড়বে।' কোপ পড়েছিল। তিনদিন আমার লেখা বেরোয়নি। অফিস থেকেই নিষেধ করা হয়েছিল। বুঝতে পারছিলাম না কেন এমন হলো। ছুটি নিয়ে বাড়িতেই বসেছিলাম। হঠাৎ অফিস থেকে ফোন। জরুরি তলব। অফিসে গিয়ে শুনলাম, আবার লিখতে হবে। উপর মহলে আমার লেখা বন্ধ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হওয়ার পর আবার লেখা শুরুর নির্দেশ এসেছে।

তখনও ভারতে জরুরি অবস্থা। রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাঁরা আমাদের কপি দেখতেন, তাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ জানতেন না। আমার লেখায় সিল দিয়ে অনুমোদন দিয়ে দিতেন। তবে আমার লেখা বন্ধ করার নেপথ্যে যাঁরা কলকাঠি নেড়েছেন তাঁরা পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হোক চাননি। আমার মনে আছে, খোন্দকার মোশতাকের ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিক (পরে তিনি এরশাদ মন্ত্রিসভার মন্ত্রীও হয়েছিলেন) সন্ধ্যার পর প্রতিদিনই আমাদের অফিসে এসে আমাদের টেলেক্স ব্যবহার করে আমেরিকায় রিপোর্ট পাঠাতেন। পরে ভারত সরকার 'আনন্দবাজার'-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার

জন্য চিঠিও দিয়েছিলেন। পরে কোনোভাবে তা সামাল দেওয়া গেছে। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে ইন্দিরা গান্ধীর বন্ধু ভূপেশ গুপ্ত প্রতিদিন রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলতেন। তা নিয়ে ভারতের পার্লামেন্টে হৈচৈও হয়েছিল।

আগে যে ফণীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নাম উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশ হওয়ার পেছনে তাঁর অবদান যদি না লিখে যাই তাহলে সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। যদিও ফণীদাকে নিয়ে লেখার ইচ্ছে ছিল না। সম্প্রতি ঢাকায় গিয়ে তোফায়েল সাহেব প্রসঙ্গটি তোলেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, নাথবাবুর সঙ্গে (তিনি ঢাকায় নাথবাবু বলেই পরিচিত ছিলেন) ১৯৬৫-তে ভারত-পাক যুদ্ধের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় হয় ত্রিপুরায়। তিনি তখন আগরতলায় পুলিশের প্রধান। ১৯৬৬ সালে লন্ডনে কমনওয়েলথ-এ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে লালবাহাদুর শাস্ত্রী পাঠিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে। সেখানেই ইন্দিরা ও মুজিবের মধ্যে দীর্ঘ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন এই ফণীদা। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় সংসদ এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিধানসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও আমেরিকা-পাকিস্তান মুজিবকে সরকার গঠনে বাধা দেয়। ফণীদার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্ক আমার নিজের চোখে দেখা। '৭২ সালে আমার মাতৃবিয়োগ হওয়া আমি তখন কলকাতায়। শ্রাদ্ধের পর যখন আমার মাথা কামানো অবস্থা তখন কলকাতার সল্ট লেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। সেখানে ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে?' আমি জানাই, 'মা মারা গেছেন।' সেদিন সেখানে ১৫/১৬ জন মন্ত্রী দাঁড়িয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। দূরে দাঁড়িয়েছিলেন ফণীদা। ফণীদাকে ডাকলেন তিনি। এরপর প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাঁদের মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়।

পরে ফণীদাকে সেদিনের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করাতে বলেছিলেন, সেদিন তিনি বাংলাদেশ, মুজিবুর রহমান সম্পর্কে সর্বশেষ খবর নিচ্ছিলেন। ফণীদা প্রায়ই ঢাকা যেতেন। স্বেচ্ছায় যেতেন না, মুজিব ও বেগম সাহেবা ডেকে পাঠালেই যেতেন। বেগম সাহেবার সঙ্গে তাঁর খুবই হৃদ্যতা ছিল। তাঁকে বলা হত গোয়েন্দাদের চাণক্য। মুখে কুলুপ, কিন্তু সর্বদা হাসি। নিজেকে কখনো জাহির করেননি। তিনি ছিলেন ইন্দিরা-মুজিব দুজনেরই খুব ঘনিষ্ঠ। তাঁর অবদান লিবারেশন সরকারের নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন সাহেব, কামরুজ্জামান সাহেব, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী– সকলেই জানতেন। তাঁর উপর এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। মুজিব বাহিনীর অর্থ তিনিই জোগাতেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, তিনি ছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীনতার নেপথ্য নায়ক। বাংলাদেশ ও ভারতের বর্তমান প্রজন্ম দূরের কথা, সাতের দশকে তাঁর

ভূমিকার কথা জানতেন শুধু এই চারজন। তাই ফণীদাকে অনেকে তুলনা করেন লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলার সঙ্গে। কাব্যে উপেক্ষিতা। সেই নাথবাবু মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই চার নেতার সঙ্গে প্রতিরাতে দেখা করে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতেন। বাংলাদেশে এখনো চার খলিফার নাম করা হয় তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুর রাজ্জাক ও রব সাহেব।

ফণীদা বা নাথবাবু খুব সম্ভবত '৭৪ সালে শীতের মরশুমে বঙ্গবন্ধুর বার্তা পেয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন। আমি তখন কলকাতায়। আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার রাইটার্সে দেখা। তিনি আমাকেও ঢাকা যেতে জোর করেন। আমি যাইনি। তিনি ঢাকায় গিয়ে পাঁচতারা হোটেলে ওঠেন। দুপুরে খাওয়ার পর সেই টেবিলেই তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুরহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। আমি ঢাকায় ফেরার পর তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম সাহেবরা বলেছিলেন, 'বালাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ওঁর ভূমিকা আমরা ভুলতে পারব না।' ঢাকার আওয়ামী লীগ মহলে আলোচনা হত, হয় সিআইএ আর না হয় কেজিবি তাঁকে মেরেছে। মস্কো এবং ওয়াশিংটনের গোয়েন্দারা ফণীদার গতিবিধির উপর নজর রাখতেন। নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, তাঁর হত্যার পেছনে সোভিয়েত গুপ্তচর গুরগানভের হাত আছে।' তিনি বলেন, কিছুদিন আগে তিনি মস্কো গেছিলেন। সেখানেও তিনি দেখেছেন, ২৪ ঘণ্টা তাঁকে নজরবন্দি রাখা হচ্ছে। আর ফণীদার মৃত্যুর সময় গুরগানভ ঢাকায় ছিলেন। কিন্তু কামরুজ্জামান-তাজউদ্দীনরা মনে করতেন, তাঁকে সিআইএ-ই খুন করেছে। তাঁর মৃত্যুর পরদিন সকালে সামরিক বাহিনীর কপ্টারে তাঁর দেহ ফেরত আসে কলকাতায়। তখন তা নিয়ে খুব একটা হৈচৈ হয়নি। শুধু এক লাইনের শোকবার্তায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব বলেছিলেন, তাঁর এই মৃত্যু গোটা দেশের গোয়েন্দা ব্যবস্থার উপরে বড় আঘাত। ফণীদার মৃত্যু, বঙ্গবন্ধু পরিবারের হত্যা এবং ইন্দিরা পরিবারের হত্যার নেপথ্যে কারা– আততায়ীর হাতে মারা যাওয়ার আগে ইন্দিরা গান্ধী তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

'৮৪-র ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেপ্টেম্বর মাসে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে একটি জনসভায় তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে কোনো সময়ে তাঁকে হত্যা করা হতে পারে। পরদিন কলকাতার রাজভবনে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দশ-পনেরো মিনিট দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তখন নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। কেউ উড়িষ্যার প্রসঙ্গ তুলছিলেন না। একেবারে শেষদিকে আমি নিজের ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন শুরুর আগেই তিনি বলেন,

'আমি তো তোমাকে চিনি। প্রশ্নটা কী?' আমি বললাম, 'আপনি বলেছেন আপনাকে হত্যা করা হতে পারে। কারা এই ষড়যন্ত্র করছে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে মারার জন্য?' তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তোমরা জানো না? কেন লিখছ না কাগজে?' আমার সঙ্গে যখন এই কথা কাটাকাটি চলছে, তিনি বলেন, 'সেটা খোঁজ করা তোমাদের দায়িত্ব।' তিনি চটে গেছেন দেখে তাঁর দু'পাশে বসা প্রণব মুখার্জি এবং বরকত গনি খান চৌধুরী আমায় থামতে বললেন। প্রেস কনফারেন্স ভেঙে গেল। তাঁর প্রচারসচিব সারদাপ্রসাদ আমায় ধরে বললেন, 'ম্যাডাম আপনাকে ডাকছেন।' ভয়ে ভয়ে গিয়ে দেখি তিনি নিজেই চা বানাচ্ছেন। প্রণব-বরকত দাঁড়িয়ে আছেন। এবার আমাকে আরো ধমক। বললেন, 'তোমরা কেন লিখছ না যে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে আমেরিকা উঠে পড়ে লেগেছে। আমার অপরাধ আমি বাংলাদেশকে সাহায্য করেছি।' আমি বললাম, 'তাহলে আমেরিকাই ষড়যন্ত্র করছে?' গলা নিচু করে বললেন, 'খোঁজ নাও এর নেপথ্যে কারা। এবং কী উদ্দেশ্য।' ঘরের ভেতর আমাদের মধ্যে যা কথা হল তা না লেখার জন্য প্রণব-বরকত দুজনেই অনুরোধ করেন। আমি লিখিনি। আমার মতো একজন জুনিয়র রিপোর্টারকে তিনি কী করে চিনলেন, সেটাও ব্যাখ্যা করা দরকার।

'৭১ সাল। তখন তিনি বারবার উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গের শরণার্থী শিবিরগুলিতে আসতেন। একবার তাঁর হেলিকপ্টারে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন তখনকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আবদুস সাত্তার। তিনি শরণার্থীদের নানা প্রশ্ন করতেন। তাঁর সামনে সাত্তার সাহেব অনুবাদ করতে দ্বিধা করছিলেন। কোচবিহারে অঝোর বৃষ্টিতে একবার ইন্দিরা আমাকে ধমকে বলেন, 'হোয়াই ডোন্ট ইউ ট্রান্সলেট?' তিনি বাংলাদেশিদের কথা বুঝতে পারছিলেন না। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের খবর আমার কাছ থেকে শোনার জন্য তাঁর প্রচারসচিব সারদাপ্রসাদ আমার সম্পাদক অশোক সরকারের কাছে একটি টেলেক্স পাঠান। টেলেক্স-বার্তা পেয়েই সম্পাদক মশাই আহ্লাদে আটখানা। তিনি বললেন, 'এখনই চলে যান। আমাদের কিছু করণীয় থাকলে করব। আপনি কথা দিয়ে আসবেন।' বিমানবন্দর থেকে সোজা সাউথ ব্লকে সারদাপ্রসাদের ঘরে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ডেকেছেন?' তিনি কথা ঘোরাচ্ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সোজা জানতে চাইলেন, তাজউদ্দীন আমাকে কী কী বলেছেন। তিনি লিখতে শুরু করলেন। আমি সেখান থেকে পূর্বী মার্গে অফিসে ফিরে এলাম। এসে শুনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ৩ বার ফোন এসেছিল। পাল্টা ফোন করলাম। সারদাপ্রসাদ বললেন,

‘কাল প্রাতঃরাশে আপনাকে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে যেতে হবে। সকাল আটটায়।’ পৌঁছে দেখি, গতকালের নেওয়া নোট প্রধানমন্ত্রী টাইপ করিয়ে রেখেছেন। সেটা আমাকে পড়ে দেখতে বললেন ঠিক আছে কি-না।

’৭৭ সালে ইন্দিরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর বাড়িতে আমি একাধিক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর কথা উঠলেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। তিনি বলেন, ‘বারবার মুজিবের জন্য হেলিকপ্টার পাঠানোর কথা বলেছি। তিনি কিছুতেই শুনতেন না।’ প্রসঙ্গত এই দুই নেতার সম্পর্কে একটি ঘটনা বলছি। ঘটনাটি শোনা মুজিবের উপদেষ্টা রুহুল কুদ্দুসের কাছে। ১৫ ডিসেম্বর তাঁরা জানতে পারেন পাকিস্তান সব শেল নিয়ে গেছে। ১৬ ডিসেম্বর তোপধ্বনির জন্য কোনো শেল নেই। রাত ৮টা নাগাদ রুহুল কুদ্দুস ও ক্যাবিনেট সচিব বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলেন। বঙ্গবন্ধু সব শুনে ওপরের ঘর থেকে ইন্দিরা গান্ধীকে ফোন করেন। ইন্দিরা গান্ধী রাত দেড়টা নাগাদ একটি বিশেষ বিমানে তোপধ্বনির জন্য শেল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর সেই শেলই ব্যবহার করা হয়েছিল তোপধ্বনির সময়। এ ধরনের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়, যা আমার মনে আছে। ’৭৩ সালে প্রথম বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ৭/৮ দিনের মধ্যে চাল-গম না পেলে বাংলাদেশের বহু লোক খেতে পাবেন না। হঠাৎ মুজিব মন্ত্রিসভার প্রধান সদস্য খাদ্যমন্ত্রী ফণি মজুমদার আমাদের অফিসে এলেন। বললেন দিল্লিতে ভারতের খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে। দিল্লিতে ‘আনন্দবাজার’-এর ব্যুরো চীফ রণজিৎ রায়কে ফোন করলাম। আধঘণ্টা পর তিনি ফোন করে জানালেন, খাদ্যমন্ত্রী পরদিন বিকেলে ফণিবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা করে এসে ফণিবাবু বলেছিলেন, ‘আমার যাওয়ার দরকার ছিল না। বঙ্গবন্ধু আগেই ইন্দিরার সঙ্গে কথা বলে গম আর চালের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।’

বঙ্গবন্ধু কতটা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন তা খোলাখুলি আলোচনার সময় এসেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার চার মাস পর আমার বস যশোহরের শিবদাস ভট্টাচার্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। শিবদা একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘সংখ্যালঘু হিন্দু-খ্রিস্টানদের প্রতি আপনার নীতি কী?’ বঙ্গবন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমার দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ। এখানে কোনো সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নেই। পাকিস্তান জেল থেকে বেরিয়েই আমি সেই ঘোষণা দিয়েছিলাম।’ সেই সভারও আমিই রিপোর্ট করেছিলাম।

মুজিব যখন ছাত্র ছিলেন, তখন কলকাতায় ‘আনন্দবাজার’ দপ্তরে ছাত্রলীগের হ্যান্ডআউট নিয়ে শিববাবুর কাছেই যেতেন। সেই থেকে দুজনের

পরিচয়। শিববাবু তখন তাঁকে বকতেন, 'পড়াশোনা ছেড়ে এইসব করছ?' সাংবাদিক বৈঠক শেষে শিবদাকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন।

'৭৫-এর জুলাইয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সূর্য সেন সংস্থার সাতজনের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় আসেন। তাঁরা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু আমরা কি বাংলাদেশের শত্রু?' তিনি প্রশ্ন শুনে জ্বলে উঠলেন। কারণ, আইয়ুব খান হিন্দুদের শত্রু বলে নির্দেশ দিয়ে গেছেন; সে নির্দেশ তখনো বহাল আছে। শুনেই তিনি তোফায়েলকে ডেকে আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরকে ডাকতে বললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মনোরঞ্জনদা, আইন পাল্টে হিন্দুদের সব সম্পত্তি ফেরানোর ব্যবস্থা করুন।' সাতদিনের মধ্যে এই বদল চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা কার্যকর হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটল।

'৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে এই আইনটি পাশ করান হাসিনা। কিন্তু সে আইন এখনো কার্যকর হয়নি। তখন ওই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। এবার একটু পেছনের দিকে তাকাই।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান চারজনকে সবসময় সহযোগিতা করতেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, আবদুস সাত্তার, মিজানুর রহমানসহ আরও বহু লোক। স্থাপিত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ওই চার নেতাকে জেলের ভেতর হত্যা করে জিয়াউর রহমান বাহিনী। এঁদের মধ্যে কামরুজ্জামানের দুই ছেলে লিটন আর স্বপন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়ত। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের যুগ্মসচিব শরদিন্দু বাবু বলেন, 'কামরুজ্জামানের দুই ছেলেকে আপনার বাড়িতে কিছুদিন রাখুন। মুজিব ঘাতকরা কলকাতার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' এ বছর মে মাসে ঢাকা বিমানবন্দরে বছর ৫০-এর এক ব্যক্তি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। জিজ্ঞেস করায় পরিচয় দিল সে স্বপন। বলল, 'মা, দিদি এখনো আপনার কথা বলেন।' দিদির সঙ্গে ফোনেও কথা বলাল। রাজশাহীতে আসার আমন্ত্রণ জানাল।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চার সেনানীকে জেলের মধ্যে ঢুকে গুলি করার ব্যবস্থা জিয়াই করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার দিন যাঁরা খোন্দকার মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদের পিস্তল দেখিয়ে শপথ নেওয়ায় সামরিক বাহিনী। তখন ভারতের খবরের কাগজে এ খবর প্রকাশিত হয়। সে সময় ঢাকা থেকে একটি ফোন পাই। খুব আস্তে কথা বলছিলেন বন্ধু ইউসুফ আলী। বললেন, 'মন্ত্রিসভায় ঢুকিনি। পিস্তল দেখিয়ে নিয়ে

এসেছে।' খোন্দকারকে সরিয়ে দিয়ে পরে পুরো মন্ত্রিসভাই জিয়া দখল করেন। সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে মন্ত্রী করা হয়। এরপরই আমেরিকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

প্রায় ৪ বছর মার্শাল লয়ের পর জিয়া নতুন দল (বিএনপি) গঠন করে নির্বাচন করেন। সেই নির্বাচনের পর খুব সম্ভবত '৮১ সালে জিয়া দিল্লি সফরে আসেন। ইন্দিরা তাঁর সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বরকত গনি খান চৌধুরী ও প্রণব মুখার্জিও ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী অতিথিদের সঙ্গে জিয়ার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। বরকতের সঙ্গে দেখা হতেই জিয়া বলে উঠলেন, 'জানেন বরকত সাহেব, নির্বাচনে লড়া খুব কঠিন কাজ।' উত্তরে বরকত বলেছিলেন, 'আপনি মিলিটারি ডিক্টেটর, আপনার নির্বাচনের কোনো দাম নেই।' দুজনের বাক্‌যুদ্ধের মাঝে এসে থামিয়ে দেন ইন্দিরা স্বয়ং। বরকত বলেন, 'আই হ্যাভ সাম এনগেজমেন্ট। অ্যাম লিভিং।' এই বলে মুজিব-ঘাতকের সম্মানে নৈশভোজ থেকে তিনি চলে আসেন।

প্রসঙ্গত, আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জিয়ার আলাপ ছিল। তিনি ত্রিপুরা সেক্টরে কাজ করলেও কলকাতায় আসতেন তাজউদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করতে। সেই সুবাদে টাঙ্গাইলের আবদুল মান্নান তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। মান্নান ও জিয়াকে নিয়ে আমি 'আনন্দবাজার' অফিসে আসি। তাঁদের সঙ্গে সহকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিই। পরে আমার একটি বই নিয়ে আমার বসকে তিনি অভিযোগ করেছিলেন। সেদিন আমার বস আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন।

পাপ বাপকেও ছাড়ে না। জিয়া সাহেবও তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। সামরিক বাহিনীর ক'জন জেনারেল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সফল হন এরশাদ। তিনিও কিছুদিন মার্শাল ল বজায় রেখে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন জাতীয় পার্টি। তিনিও একই কায়দায় সামরিক বাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেন। তাঁর নির্বাচন অবৈধ বলে নিন্দা ওঠে আন্তর্জাতিক মহলে। দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে রাখার জন্য তিনি তাঁর বন্ধু, কলকাতার এক ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদককে ধরেন। এই যাবতীয় ঘটনা যাঁর কাছে শোনা তিনি তখন ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে 'র'-এর প্রধান ছিলেন। প্রয়াত বিভূতি নন্দী। একদিন গল্পচ্ছলে তিনি বলেছিলেন, 'হাসিনাকে বারবার সতর্ক করেছিলাম।' ময়মনসিংহের

বিভুতিবাবু সারা জীবনই বাঙাল ভাষায় কথা বলে গেছেন। শোনা যায় ওই সাংবাদিক দিল্লি থেকে লন্ডন হয়ে ঢাকায় গিয়ে সামরিক বাহিনীর অতিথিশালায় উঠেছিলেন। এরশাদ আওয়ামী লীগ নেতাদের বশে আনতে না পারলেও তাঁর মূল রাগ ছিল হাসিনার ওপরে। বিভূতিবাবু আরো বলেছিলেন, সমস্ত ঘটনার খবর নিয়ে দিল্লি পৌঁছানোর আগেই ওই সাংবাদিক রাজীব গান্ধীকে ভুল বুঝিয়েছিলেন। হাসিনাকে কয়েকবার হত্যার ষড়যন্ত্রও করা হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছিলেন।

কোচবিহারে এরশাদ তখন পাকিস্তানের হয়ে লড়াই করছিলেন। ফিরে আসা সমস্ত সামরিক অফিসারদের মুজিব সসম্মানে বহাল করেছিলেন। এরশাদ একটানা ৮ বছরের বেশি সময় ক্ষমতায় ছিলেন। ঐ সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একটানা আন্দোলন চালিয়েছিল। সে আন্দোলনে এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। '৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। প্রধানমন্ত্রী হন মুজিব কন্যা হাসিনা। ২০১৩ সালে যাতে একটি সুস্থ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হয় তার জন্য দিল্লি আপ্রাণ চেষ্টা করে। ২০১৩ সালে জেনারেল এরশাদকে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান। পৃথক আমন্ত্রণ জানান খালেদা জিয়াকেও। ৭ নং রেসকোর্স রোডে দুজনকেই আলাদা করে আপ্যায়ন করা হয়। সেখানে ছিলেন আবু হোসেন খান চৌধুরী (ডালু) এবং দীপা দাশ মুন্সি। মনমোহন সিং ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন বোঝান নির্বাচনে অংশ নিতে। দিল্লিতে রাজি হয়ে ফিরে গিয়ে আমেরিকানদের চাপে নির্বাচনে অংশ নেননি খালেদা জিয়া।

এরশাদের প্রথম মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন কুমিল্লার মিজানুর রহমান। সেই সময়ে তিনি কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে কলকাতার এয়ারপোর্ট হোটেলে ওঠেন। হঠাৎ ফোন পেলাম মিজান ভাই আমার আর আমার প্রয়াত সহকর্মী তুষার পণ্ডিতের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা চলে গেলাম। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা ধরে আমাদের মধ্যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। আমি বলেছিলাম, 'আপনি মুক্তিযোদ্ধা। আপনিও আওয়ামী লীগ ছেড়ে এরশাদের সঙ্গে যোগ দিলেন?' যেহেতু বন্ধু, তাই তিনি বললেন, 'আপনারা যাই ভাবুন, বাংলাদেশে এরশাদ ছাড়া বিকল্প নেই।' 'এরশাদ তো আপনাদের নেতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। আপনার কি মনে হচ্ছে না বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আরও তলিয়ে যাচ্ছে?' মিজান ভাই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। রাতটা কলকাতাতেই

কাটালেন। ইতিমধ্যে '৭১-এ তিনি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের যে এয়ার হোস্টেসকে বিয়ে করেছিলেন, তিনিও চলে এলেন। আমরা উঠে এলাম।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি প্রধান না সংসদীয় ব্যবস্থা হবে- এ নিয়ে মুজিব ঘনিষ্ঠ কামাল হোসেন লন্ডন থেকে দিল্লি আসার পথে বিমানে দীর্ঘ আলোচনা করেন। দিল্লি থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে কামাল হোসেনের কথায়- বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রই চেয়েছিলেন। তাই '৭৩ সালে নির্বাচন হয়।

১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে খুব সম্ভবত তাজউদ্দীনের বাড়িতে প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু বলেন, সংসদীয় প্রথাই সেরা প্রথা। সে বৈঠকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করেন। তাজউদ্দীন তাঁকে বলেন, 'আপনার দেশ স্বাধীন করে দিয়েছি। আপনি আমায় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়ে দলের সম্পাদক করে দিন।' বঙ্গবন্ধু তাঁকে ধমকে থামিয়েছিলেন। এই ঘটনা আমাকে তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম ও কামাল হোসেন বলেছিলেন।

এই নতুন অধ্যায়ে টাইগার সিদ্দিকী বা কাদের সিদ্দিকীর কথা লিখতেই হবে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে তাঁর মাকে ইন্দিরা বলেছিলেন, 'তুমি রত্নগর্ভা।' তিনি সামরিক বাহিনীর মধ্যে, জিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ইন্দিরার নির্দেশে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বরকত সাহেব ও প্রণব বাবু। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি এখন কী করছেন?' বললেন, 'দাদা, বঙ্গবন্ধুর পায়ে অস্ত্র সমর্পণ করে ঠিক করেছিলাম তাঁর নির্দেশ মতোই চলব।

পরিশিষ্ট ১

[গোপনীয়]

প্রেরক : জি. মজুমদার
সীমান্ত রক্ষীবাহিনী

কলকাতা
২৫ নভেম্বর, ১৯৭৪

প্রিয় শ্রী রুস্তমজী,

বাংলাদেশে যে-অবস্থা চলছে তা সন্তোষজনক নয়। গুপ্ত হত্যা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। দুর্মূল্য এবং অত্যাবশ্যক সামগ্রীর অভাব সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে। বন্যা-বিপন্ন বহু নরনারী প্রাণ হারাচ্ছে নানা জায়গায়। নতুন ফসল ওঠায় চালের দাম নেমে হয়েছে এক সের সাড়ে পাঁচ টাকা; কিন্তু তাও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। বিরোধী দলগুলি একটা যুক্তফ্রন্ট গড়ার চেষ্টা করছে এবং গুজব, শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছে। বলা হচ্ছে, শেখ মুজিবর রহমান সন্ধি করতে চাইছেন তাজউদ্দীনের সঙ্গে। কিন্তু তাঁরা দু'জনে ফের কতটা বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারবে তা দেখবার। সাম্প্রদায়িক দলগুলি সক্রিয় হয়ে উঠছে বাংলাদেশে আর ভারতবিরোধী প্রচার জোরদার হচ্ছে দিনের পর দিন। চোরাচালান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে সব পাট ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। চিনি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশে পনেরটি চিনি কলে উৎপাদন বাড়ানোর একটা পরিকল্পনা আছে।

স্বাঃ গোলক মজুমদার

শ্রী কে. এফ. রুস্তমজী, আই. পি
বিশেষ সচিব, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক
ভারত সরকার
নয়াদিল্লি

[গোপনীয়]

প্রেরক : জি. মজুমদার
সীমান্ত রক্ষীবাহিনী থেকে

কলকাতা
১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৫

প্রিয় শ্রী রুস্তমজী,
বাংলাদেশের পরিস্থিতি কঠিন হয়ে চলেছে। দশ টাকা সের নুন আর এক সের সরষের তেলের দাম পঁচিশ টাকা। উচ্চপদস্থ অফিসার এবং রাজনীতিকদের দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষ বিরক্ত হয়ে গেছে। শেখ মুজিবর রহমানের দেশ শাসনের যোগ্যতা নিয়ে খোলাখুলি প্রশ্ন তুলেছে কোনো কোনো মহল। বিরোধী শক্তিগুলি জোর চেষ্টা চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী ফ্রন্ট গড়ে তুলতে এবং বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে সশস্ত্র সংঘর্ষ আর বিরল ঘটনা নয়। বেশ কিছু সেনা এবং পুলিশ ঘাঁটি আক্রান্ত হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে মারাত্মক ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে ঢাকা শহরে। অদম্য হয়ে উঠেছে ছাত্রসমাজ। বাংলাদেশের যা কিছু খারাপ তার জন্য ভারতের কাঁধে দোষ চাপানোর চেষ্টা চলছে এবং এইভাবে একটা সাম্প্রদায়িক আবহাওয়াও বেশ দ্রুত চাঙ্গা হয়ে উঠছে। হিন্দুরা হতাশ হয়ে পড়ছে ক্রমে এবং তাদের মধ্যে এমন ধারণা দেখা দিচ্ছে যে বাংলাদেশে তারা অবাঞ্ছিত।

স্বাঃ গোলক মজুমদার

শ্রী কে. এফ. রুস্তমজী
স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ সচিব
ভারত সরকার
নয়াদিল্লি

[গোপনীয়]

জি. মজুমদার
সীমান্ত রক্ষীবাহিনী

কলকাতা
১২ মার্চ, ১৯৭৫

প্রিয় শ্রী রুস্তমজী,

বাংলাদেশ মনে হয়, নৈরাজ্যের দিকে এগোচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমানের একদলীয় শাসনকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছে আওয়ামী লীগের লোকেরা এবং বুদ্ধিজীবীগণ। কোনো দিকেই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না এবং বোঝা যাচ্ছে, শেখ সাহেব তাঁর সহকর্মী আর রাজনৈতিক বিরোধীদের পাইকারিভাবে আত্মসমর্পণের জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। এগার থেকে পনের জনের এক পোলিটব্যুরো করার কথা ভাবছেন তিনি। নিজে থাকবেন পোলিটব্যুরোর প্রধান। আর এর সদস্য করার জন্য মৌলানা ভাসানী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জমান, তিন সেনাপ্রধান এবং রুখউল কুদ্দুস-এর নাম শোনা যাচ্ছে। শেখ সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তাজউদ্দীনকে তাঁর পোলিটব্যুরোতে ভিড়াতে। কিন্তু তিনি রাজি হচ্ছেন না। উভয় সংকটে পড়েছেন তিনি। যদি তিনি পোলিটব্যুরোতে যোগ দেন আর অবস্থার কোনো উন্নতি না হয় তা হলে সব দোষ তাঁর কাঁধে চাপিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মৃত্যু ঘটাবেন শেখ সাহেব। আবার যদি যোগ না দেন তা হলে তাঁকে গ্রেফতার করে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন শেখ। পনের সদস্যের পোলিটব্যুরো হলে তাতে মণি সিং, মুজফ্‌ফর আহমেদ, পুলিশের আই.জি এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হাসানকে নেওয়া হবে। শেখ মুজিবর রহমান শিগগিরই একাত্তর জন সদস্যের যে সাধারণ পরিষদ গঠন করতে চাইছেন, তাজউদ্দীন চান তাতে যোগ দিতে। উনিশ শ' একাত্তর সালে আন্দোলন শুরু হয় বলে পরিষদের সংখ্যাটা একাত্তর করা হচ্ছে। এতে থাকবে কুড়িজন মন্ত্রী, তিন সেনা-প্রধান, সাতজন সচিব, পুলিশের আই.জি, ন্যাপের দু'জন, দু'জন কমিউনিস্ট, আতাউর রহমান, মৌলানা ভাসানী এবং আওয়ামী লীগের সদস্যরা। রাজ্জাক প্রতিনিধিত্ব করবে যুবলীগের, কৃষক লীগ থেকে থাকবে ব্যারিস্টার বাদল এবং অপর দু'জন। পূর্ববর্তী আওয়ামী দলের জিল্লুর রহমান এবং মহিউদ্দীন, ভাসানী ন্যাপ। ডা. আমিনুল গাজীরও স্থান হতে পারে এতে।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রকাশ্যে বলে যাচ্ছেন, আর ছ'মাসের বেশি টিকবে না মুজিবুর রহমান। তারপরে সেনাবাহিনীই ক্ষমতা দখল

করবে বাংলাদেশে। মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সম্পূর্ণ চুপ করে আছেন। ঘটনা যেদিকে গড়াচ্ছে তা দেখে জেনারেল ওসমানী এতই বিরক্ত হয়েছেন যে তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন তাঁর পুরনো কেন্দ্র শ্রীহট্টে কাজ করতে। জিয়া এবং ওসমানীর পাল্টা হিসাবে মুজিবুর রহমান লে. জেনারেল ওয়াসিউদ্দীনকে ফিরিয়ে আনবার কথা ভাবছেন বলে গুজব। তাঁকে করা হবে, চীফ অব আর্মি স্টাফ অথবা ডিফেন্স চীফ। শেখ মুজিবুর রহমানের এই একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতা হাতে নেওয়াটা ড. কামাল হোসেন পছন্দ করেননি, এরা সপরিবারে অক্সফোর্ড চলে গেছেন। এখন তিনি সেখানে অতিথি অধ্যাপক। তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান বারবার লোক পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে। তিনি বোধ হয় 'না' বলে দিয়েছেন। কামরুজ্জমান, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং আরও অনেকে গুমরে চলেছেন মুজিবের চাপের তলায় এবং মুজিবের মাতব্বরিকে চ্যালেঞ্জ জানাবার সুযোগের অপেক্ষা করছেন। মুজিব অবশ্য তাদের চেপে রাখতে চাইছেন গোপন ফাইলের ভয় দেখিয়ে। ওদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আই.জি পুলিশকে দিয়ে ওইসব ফাইল তৈরি করিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন তিনি।

ভারত-বিরোধী একটি খবরের কাগজকে রাতারাতি ভারতবন্ধু সাজতে দেখা যাচ্ছে। তার সম্পাদক বলেছে, একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তার আব্বাজান আওয়ামী লীগ গড়েননি। যখনই তিনি স্বাধীনতা পাবেন, সঠিক কথা লিখে যাবেন। বাংলাদেশে মুজিবের এখনমাত্র চারটি সংবাদপত্র থাকছে। দুটি তাঁর দলের আর দুটি সরকারি কাগজ।

বিদেশী জিনিসে ছেয়ে গেছে বাংলাদেশের বাজার। দাম চড়া; কিন্তু খদ্দেরের অভাব হচ্ছে না। ভারতীয় ত্রিশ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশি একশ' টাকা পাওয়া যায়। চরম দুর্দশা চলছে পল্লী অঞ্চলে। আশঙ্কা হচ্ছে, আকালের সময় (জুন-জুলাই) দেশত্যাগের হিড়িক লেগে যাবে।

ভারতে আসবার জন্য দৈনিক সাত থেকে আটশ' ভিসার দরখাস্ত পড়ছে আমাদের ঢাকা অফিসে। অন্তত পাঁচশ' লোকের ভিসা মঞ্জুর হচ্ছে রোজ। ভিসা নিয়ে যারা আসছে তাদের অনেকেই আর ফিরে যাবে না বলে মনে হয়।

মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল ঢাকায় ফিরে এসেছে। সে এক গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে নেমে পড়েছে তার বাবার বিরোধীদের বাগাতে। জামাল লন্ডনেই রয়ে যাচ্ছে।

ঘটনার গতি-প্রকৃতি দেখে আশঙ্কা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান যে-কোনো দিন নিহত হতে পারেন এবং তা গোটা দেশকে নৈরাজ্যে নিমজ্জিত করবে।

জানা গেল ভারতের সমুদ্র-সীমার ছয়-হাজার বর্গমাইল এলাকা অসলারড, ইউনিয়ন 'অয়েল এবং অ্যাটলান্টিক রিচ ফিল্ড– এই তিনটি মার্কিন সংস্থাকে তেল অনুসন্ধানের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও যুগোশ্লাভিয়ার ইনকা-ন্যাপথা, জাপান পেট্রোলিয়াম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এবং কানাডার সুপিরিয়র অয়েল– এই তিনটি সংস্থাও নাকি তেলের জন্য ভারতের সমুদ্র এলাকায় কাজ করতে পারে। এ ব্যাপারে আলোচনার আর রাখ-ডাক করছে না ঢাকা।

স্বাঃ গোলক মজুমদার

শ্রী কে. এফ, রুস্তমজী
বিশেষ সচিব, স্বরাষ্ট্র দফতর
ভারত সরকার
নয়াদিল্লি

[গোপন পত্র]

জি. মজুমদার
সীমান্ত রক্ষীবাহিনী থেকে

কলকাতা
৩ মে, ১৯৭৫

প্রিয় শ্রী রুস্তমজী,

বাংলাদেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে। সবরকম প্রশাসনিক প্রয়াস সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। চরমপন্থীরা এবং আইন অমান্যকারীরা প্রশাসনের সামনে একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়ে আছে। দুর্মূল্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী বিলি-বন্টনে অব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং বেকারী সাধারণ লোকের সামনে এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দিয়েছে রাজনীতির ভবিষ্যত নিয়ে। আস্থার ভাব হারিয়ে ফেলেছেন অফিসাররা। তাঁরা অনুভব করছেন, এখানে স্বাধীনভাবে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া বা বলতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। প্রবীণ কিছু রাজনীতিক 'বাকশাল'-এ যোগ দিলেও তার নীচের স্তরের লোকেরা এখনো দূরে সরে আছে এবং সাধারণ লোকদের মধ্যে মিশে গিয়ে গোপনে তারা সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। জেলাগুলির ভার গভর্নরদের উপর ন্যস্ত করায় এবং থানায় প্রশাসক বসানোতে অফিসাররা ক্ষুব্ধ। ভারত-বিরোধী মনোভাবও ক্রমে ক্রমে চাঙ্গা হয়ে উঠছে।

স্বাঃ গোলক মজুমদার

শ্রী কে. এফ. রুস্তমজী
বিশেষ সচিব, বিদেশ দফতর
ভারত সরকার
নয়াদিল্লি

[গোপনীয়]

জি. মজুমদার
সীমান্ত রক্ষীবাহিনী থেকে

কলকাতা
৩১ মার্চ, ১৯৭৫

প্রিয় শ্রী রুস্তমজী,

বাংলাদেশের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। শেখ মুজিবুর রহমান সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েও দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা আনতে পারলেন না। বাকি আইন অমান্যকারীদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ভয়ে পুলিশ এবং ডি. আর'-এর অফিসাররা পর্যন্ত রাত্রে আর বাইরে পা দিতে চায় না। এ অঞ্চলে ধর্মীয় গোঁড়ামি জোরদার হচ্ছে যার ফলে নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলছে হিন্দুরা। ভারতবিরোধী প্রচার প্রশ্রয় পাচ্ছে আর জনমনে তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে এর ফলে। রাজনৈতিক নেতারা চুপ করে আছে এবং নয়া ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার সুযোগের অপেক্ষা করছে। ড. কামাল হোসেনকে জোর করে দেশে আনানো হয়েছে এবং অতি বেদনার সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক প্রত্যাধিকার করতে হয় তাকে। খবরের কাগজগুলির মোটামুটি কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। সরকার বিরোধী কোন কিছু লিখতে দেওয়া হয় না। দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণ বেড়ে চলেছে স্তরে স্তরে। বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি নিজ নিজ স্বার্থে তীক্ষ্ম নজর রাখছে বাংলাদেশের ঘটনা-গতির দিকে। দিকে দিকে অনাস্থা মাথাচাড়া দিচ্ছে বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে।

স্বাঃ গোলক মজুমদার

শ্রী কে. এফ. রুস্তমজী
বিশেষ সচিব, বিদেশ দফতর
ভারত সরকার
নয়াদিল্লি

পরিশিষ্ট ২

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১০ এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়,

এবং

যেহেতু নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ ১৯৭১ সনের ৩ মার্চ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু আহূত ওই পরিষদ খেয়াল-খুশি মতো এবং বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের হঠাৎ ন্যায়নীতি-বহির্ভূত ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে-সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাচ্ছে,

এবং

যেহেতু, পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের একত্রিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলেছে,

এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের উপর নিজেদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে,

আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে অধিকারনামা দিয়েছেন সেই অধিকার মোতাবেক আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং সেই সঙ্গে পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন করছি,

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন,

এবং

রাষ্ট্রপ্রধানই থাকবেন সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত

এবং

রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের এবং ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতার অধিকারী,

প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগের অধিকারও তাঁর থাকবে,

কর আরোপ এবং অর্থ ব্যয়ের অধিকার থাকবে তাঁর,

তিনি গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতবি ঘোষণা করতে পারবেন, তা ছাড়া বাংলাদেশের জনগণের আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেনঃ

আমরা, বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আরও ঘোষণা করছি যে, কোনো কারণে রাষ্ট্রপ্রধান যদি না থাকেন অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে

যদি অক্ষম হন তা হলে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতিসঙ্ঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তেছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক শ্রী ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে নিযুক্ত করছি।

স্বাঃ এম. ইউসুফ আলী

যথাযথভাবে নিযুক্ত অধিকারী
বাংলাদেশ কনস্টিটুয়েন্ট
অ্যাসেমব্লির আয়ত্তাধীন অধিকার বলে

পরিশিষ্ট ৩

বাংলাদেশের জনগণের প্রতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
তাজউদ্দীন আহমদ-এর বেতার ভাষণ

বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত
মুজিব নগর : ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১

আমার স্বাধীন বাংলাদেশের বীর এবং সাহসী ভাই-বোনেরা,

সাড়ে-সাতকোটি মুক্তিপাগল মানুষের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা স্মরণ করছি তাঁদের যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে জীবন আহুতি দিয়েছেন। আকাশে যতদিন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা থাকবে, মাটিতে মানুষ থাকবে, ততদিন বীর শহীদদের এই সমরকৃতিত্ব অম্লান থাকবে বাঙালির মানসপটে। পঁচিশ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া তার ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পতাকাতলে আমরা আজ একাত্ম। যে প্রতিরোধ আপনারা গড়ে তুলেছেন তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম ও অসাধারণ মনোবল– যা নিয়ে আপনারা ইয়াহিয়ার ফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন– প্রমাণ করলো এক নতুন বাঙালি জাতি জন্ম নিচ্ছে।

বিশ্বে আমাদের পরিচয়– শান্তিপ্রিয়, মানবতাবাদী, নৃত্য-গীত, শিল্প-সংস্কৃতির পূজারিরূপে। হিংসা আমাদের চরিত্রের বিরোধী। কিন্তু আজ যখন প্রবল মারণাস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন, আমরা সেই মহান ঐতিহ্যে অবিচল থেকেও প্রমাণ করে দিয়েছি, বাঙালি দরকার হলে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্ত হাতে অস্ত্র ধরতে জানে।

শত্রু যখন মরণ-কামড় দিতে আসে, সঙ্গে সঙ্গেই আপনারা যদি জীবনপণ করে রুখে না দাঁড়াতেন, তা হলে এই নতুন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কোথায় তলিয়ে যেত এই দুনিয়ায়। জানি না আবার কত যুগ যেত জেগে উঠতে। কিন্তু আপনারা জীবন দিয়ে সেই সর্বনাশ প্রতিরোধ করেছেন। ওদের আক্রমণ কামানে-বিমানে। আপনাদের প্রতিরোধ শূন্য হাতে কিন্তু অনির্বাণ দেশপ্রেমে। শত্রু আজ পিছু হটছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকা আজ মুক্ত। দুনিয়ার সাংবাদিকরা আজ স্বাধীন

বাংলাদেশে স্বচ্ছন্দে ঘুরছে, বিস্মিত হচ্ছে সব দেখে, চারদিকে পাঠাচ্ছে আমাদের বিজয় বার্তা। গোটা পৃথিবী এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে আমাদের সংগ্রামের তাৎপর্য। বাংলাদেশের সর্বত্র এখন প্রতিরোধ-বাহিনী শক্ত পায়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী এসে সামিল হচ্ছে এই স্বাধীনতার সংগ্রামে।

আজ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর অভিজ্ঞ সৈনিকেরা এসে যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে। এতে আরও জোরদার হয়েছে মুক্তি-ফৌজ। এই জোর বিপুল, প্রবল হয়ে উঠছে পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ এবং হাজার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ায়। ভাড়াটে পাক-সৈন্যদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্র দিয়েই পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে আমাদের মুক্তিবাহিনীর এই সব তরুণ-তরুণীরা। পৃথিবীর নানা দেশে আমাদের যে বাঙালি ভাই-বোনেরা রয়েছে তারাও আমাদের জন্য তহবিল খুলে অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়ে আধুনিক সব অস্ত্র কিনে পাঠাচ্ছে। আজ আর আমরা নিরস্ত্র নই।

শ্রীহট্ট-কুমিল্লা অঞ্চলে মেজর খালেদ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে মেজর জিয়া, ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল এলাকায় মেজর শফিউল্লাহ্ প্রমুখের নেতৃত্বে এক একটি সুগঠিত বাহিনী শত্রুদের পর্যুদস্ত করে মুক্ত করে চলেছে একের পর এক অঞ্চল।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর মেজর ওসমান। খুলনা-কুষ্টিয়া, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল-পটুয়াখালী প্রভৃতি এলাকায় মুক্তিফৌজ বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করেছে তাঁর নেতৃত্বে।

ই.বি.আর এবং ই.পি.আর-এর সৈন্যদের দিয়ে গঠিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্য মুক্তিফৌজ। ইতোমধ্যে তারা রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা এবং বগুড়া মুক্ত করেছে।

আমরা এখন বিশ্বের সাংবাদিক, কূটনীতিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের আহ্বান করছি বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলগুলি দেখে যেতে। তাছাড়া রেডক্রস জাতীয় যে-সব আন্তজার্তিক সংস্থা মানবিক কারণে আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক অথচ ইসলামাবাদের বাধায় তা করতে এতদিন পারেননি, তাঁদের কাছে আবেদন, এখন আর বাধা নেই। আপনারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে যাঁরা পাকিস্তানকে অস্ত্র যোগাচ্ছে, তাঁদের উদ্দেশে বলছি পাক জল্লাদবাহিনীর হাতে আর অস্ত্র দেবেন না। বহিরাক্রমণ

ঠেকানোর নাম করে আনা ওই অস্ত্র আজ বাংলাদেশের নিরপরাধ নারী-শিশুকে হত্যার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর সেই সঙ্গে যে সকল দেশ স্বাধীনতার মর্যাদা দেয়, যারা একদা অত্যাচারী শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়েছে তাদের কাছে অনুরোধ আমাদের অস্ত্র দিন, অস্ত্র দিন। তবে সেই বন্ধুদের বলে রাখি আমাদের এ লড়াই স্বাধীনতার লড়াই। কেবল স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধায়, শুভেচ্ছায়, শর্তহীন, নিষ্কণ্টক যেন হয় ওই দান। না হলে চাইনে।

বিশ্বসমাজ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে বৃহত্তম দেশগুলির মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করতে যাচ্ছে নতুন এক রাষ্ট্র, স্বাধীন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারত ইতিমধ্যেই পাকিস্তানী গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। রাশিয়া এই নিপীড়ন বন্ধ করতে বলেছে পাকিস্তানকে। বৃটেনও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। সিংহল এবং ব্রহ্মদেশ তাদের দেশ থেকে পাকিস্তানি বিমানকে তেল দিতে অস্বীকার করেছে।

বর্বর পাক-ফৌজের দখলীকৃত অঞ্চলে আমাদের যে অবরুদ্ধ ভাই-বোনেরা দিবা-রাত্রি মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে রয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে বলছি, মনোবল হারাবেন না। মুক্তি-ফৌজের শক্তির উপর আস্থা রাখুন। জয় আমাদের অতি সন্নিকটে। ইনশাআল্লাহ।

তবে এই জয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংস্তূপের উপর যে বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব, তা হবে সর্বঅর্থে আদর্শ। মনে রাখতে হবে, জনগণের দ্বারা পরিচালিত এই যুদ্ধ যথার্থ জনযুদ্ধ। এই দেশ হবে মেহনতী মানুষের এক শোষণমুক্ত ভূমি। আমাদের মুক্তির মধ্যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে ক্ষুধা, ব্যাধি, অশিক্ষা ও বেকারি থেকে মুক্তির। এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আধুনিক, গণতান্ত্রিক সমাজ; যার ভিত্তি সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার। জয় বাংলা।

পরিশিষ্ট ৪

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি
১৯৭২-এর মার্চ ঢাকায় ভারত ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত

অত্র তারিখ পূর্বাহ্নে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় পারস্পরিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক সংহতির প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে দু'দেশের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তির এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। বারোটি অনুচ্ছেদ বিভক্ত ভারত-সোভিয়েত চুক্তির অনুরূপ এই ঐতিহাসিক চুক্তির মেয়াদ পঁচিশ বছর। তবে উভয়ের সম্মতি থাকলে এই চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যায়।

ভারত ও বাংলাদেশ একে অপরের আঞ্চলিক সংহতি রক্ষায় সম্মত। যে কোনো একটি দেশের নিরাপত্তা বা সংহতি বিপন্ন হলে কার্যকর উপায় উদ্ভাবনের জন্য দু'দেশের মধ্যে আলোচনা হবে।

ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই দেশের বিরুদ্ধাচারী কোনো সামরিক জোটে যোগ দেবে না। গোপনে বা প্রকাশ্যে এই দুই দেশ অন্য কোনো দেশের কাছে এই চুক্তির ধারার বিষম কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে না।

ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই সম্মত হয় যে, এই দুই দেশের যে কোনো একটির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হয় বা সামরিক ক্ষতি ঘটে এরূপ কোনো কাজের জন্য উভয়েই তাদের নিজ নিজ এলাকাকে ব্যবহৃত হতে দেবে না। কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে এই দুই পক্ষের উভয়েই তৃতীয় পক্ষকে সাহায্য দানে বিরত থাকবে।

এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় দেশের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিলোপসাধন। এতে বিশ্বের যে কোনো স্থানের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

কার্যত এই চুক্তিটি সংস্কৃতি, শিক্ষা, কৃৎবিদ্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারত ও বাংলাদেশ সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি,

খেলাধূলা স্বাস্থ্য-উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দুই দেশের লক্ষ্য একই– শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদ।

উভয়েই জোটনিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করায় আগ্রহী। অতএব এর ফলে উভয় দেশের সীমারেখা অতঃপর স্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমারূপে চির চিহ্নিত থাকবে।

দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী শ্রী স্বর্ণ সিং আবদুস সামাদ আজাদের উপস্থিতিতে বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শ্রীমতী গান্ধী এবং শেখ মুজিব এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বেলা তখন বাংলাদেশী সময়, সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট। স্বাক্ষরের তারিখ থেকে চুক্তিটি বলবৎ।

চুক্তির পূর্ণ বয়ান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে
মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য একযোগে সংগ্রাম, রক্তদান এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার ফলশ্রুতি হিসাবে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয়-অভ্যুদয় ঘটিয়ে,

সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসাবে রূপান্তরণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে,

নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতিসমুহের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে,

শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব স্ব দেশের অগ্রগতির জন্য,

উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে,

এশিয়া তথ্য বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযেগিতা আরো সম্প্রসারিত করার বিশ্বাসী হয়ে,

বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে, আন্তজার্তিক উত্তেজনা প্রশমনে এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদের অবশেষসমূহ চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার জন্য প্রয়াস চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,

আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান যে শুধুমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব, বৈরিতা ও সংঘাতের মাধ্যমে নয়– এ ব্যাপারে কৃতনিশ্চয় হয়ে,

রাষ্ট্রসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহ অনুসরণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনরুল্লেখ করে এক পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও অন্য পক্ষে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ এক

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং স্বার্থত্যাগ করেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, উভয় দেশ এবং তথাকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে। একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উল্লেখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সমতা ও লাভজনক নীতিসমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সার্বিক সহযোগিতার সম্পর্কের আরো উন্নয়ন জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ দুই

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়েই চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্বপ্রকারের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে।

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার প্রতি সমর্থন দান করবে।

অনুচ্ছেদ তিন

বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমন, আন্তজার্তিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মজবুত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের আস্থার পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ চার

উভয় দেশের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চুক্তিকারী উভয়পক্ষ সকল স্তরে বৈঠক ও মতবিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ পাঁচ

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধাজনক ও সর্বাত্মক সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশের সমতা ও পারস্পরিক সুবিধার নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ ছয়

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, নদী-অববাহিকার উন্নয়ন এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ-ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা, পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ অভিন্নমত।

অনুচ্ছেদ সাত

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলার ক্ষেত্রে সম্পর্কের প্রসার করবে।

অনুচ্ছেদ আট

দুই দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ প্রত্যেকে মর্যাদার সঙ্গে ঘোষণা করছে, তারা

একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনো সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশ নেবে না। অন্যের উপর আক্রমণ থেকেও নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের এলাকায় এমন কোনো কাজ করতে দেবে না যাতে চুক্তিকারী কোনোপক্ষের ক্ষতি হতে পারে বা তা কোনোপক্ষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ নয়

কোনো এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তিকারী প্রত্যেকে এতদুল্লেখিত তৃতীয় পক্ষকে যে-কোনো প্রকার সাহায্য দানে বিরত থাকবে। তা ছাড়া যে-কোনো পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই আশঙ্কা নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে উভয়পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়ে নিজেদের দেশের শান্তি এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ দশ

চুক্তিকারী উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ ঘোষণা করছে, এই চুক্তির পক্ষে অসামঞ্জস্য হতে পারে এমন গোপন বা প্রকাশ্যে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে উভয়ের কেউই কোনো অঙ্গীকার করবে না।

অনুচ্ছেদ এগারো

এই চুক্তি পঁচিশ বছরের মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তিকারী উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। অত্র চুক্তি সহি করার দিন থেকে কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ বারো

এই চুক্তির কোনো একটির বা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তব অর্থ করবার সময় চুক্তিকারী উচ্চমর্যদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মনোভাবের দ্বারা শান্তিপূর্ণ আলোচনায় নিষ্পত্তি করতে হবে।

পরিশিষ্ট ৫

যৌথ ইশতেহার

১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর দু'দিনব্যাপী ভারত-সফর শেষে প্রচারিত।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সরকারি আমন্ত্রণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৭-এর ১৯ এবং ২০ ডিসেম্বর– এই দু'দিন রাষ্ট্রীয় সফর সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি শ্রী নীলম সঞ্জীব রেড্ডি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই আন্তরিকতাপূর্ণ স্বাগত জানান।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধাপুষ্প অর্পণ করেন এবং সদলে আজমীর-এ হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির দরগাহ-এ শরিফ-এ যান।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তাঁর সফরকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রীকে ঢাকা সফরের আমন্ত্রণ জানান।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিলিত হয়ে উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর বসে দু'দেশের মিলিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধি বৈঠক। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করেন বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা অধ্যাপক মহম্মদ শামসুল, বিদ্যুৎ জলসম্পদ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রকের উপদেষ্টা বি. এম. আব্বাস, বিদেশ সচিব তবারক হোসেন এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করেন ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম, বিদেশমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, কৃষি ও সেচমন্ত্রী শ্রী সুরজিৎ সিং বারনালা, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব শ্রী ভি. শঙ্কর, বিদেশ সচিব শ্রী জে.এস.মেটা, সেচ দফতরের সচিব শ্রী সি.সি. প্যাটেল ও অন্যান্য পদস্থ অফিসার।

উভয় দেশের প্রতিনিধিরা পারস্পরিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক যে-সকল প্রশ্নে দু'দেশেরই স্বার্থ জড়িত সেইসব প্রসঙ্গ নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ও হৃদ্যতাময় পরিবেশে আলোচনা করেন। আলোচনায় পারস্পরিক স্বার্থগুলির বহু বিষয়েই উভয় দেশের মনোভাবের ব্যাপক সামঞ্জস্য প্রকাশিত হয় এবং

উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এই পরিবেশকে আরও সংহত ও সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উভয় নেতাই স্বীকার করেন।

নেতৃদ্বয় স্বীকার করেন যে, দুই দেশ ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও উভয় পক্ষ উপলব্ধি করেন। তাঁরা পুনর্বার ঘোষণা করেন যে, দুই দেশই জোটনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দুই দেশই সার্বভৌম ঐক্য, স্বাধীনতা ও পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণে বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বিশ্বাস করেন যে এই নীতি এতদঞ্চলে শান্তির পরিবেশ আরও জোরদার করতে সাহায্য করবে এবং এর ফলে গোটা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

দু'দেশের নেতৃদ্বয় মনে করেন, ১৯৭৭-এর ৫ নভেম্বর ঢাকায় ফারাক্কার গঙ্গাজল ও তার বহমানতা নিয়ে যে চুক্তি হয় তা ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। দুই দেশের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মনোভাবের ফলেই এই চুক্তিটি সম্ভব হয়েছে। গঙ্গাজলের বহমানতা বজায় রাখার সমস্যা নিয়ে দ্রুত দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের উপর নেতৃদ্বয় গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা আরও মনে করেন উভয় দেশের জনগণের স্বার্থের খাতিরেই এর জন্য যথাবিহিত কাজ করা প্রয়োজন। তাঁরা স্বীকার করেন যে, এ সম্পর্কিত চুক্তিটি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রসারের এবং সর্বোপরি এতদঞ্চলের জলসম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের পথ খুলে দিয়েছে।

নেতৃদ্বয় দৃঢ়তার সঙ্গে অনুমোদন করছেন যে, মানবিক মূল্যবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা এবং সমানুভূতির যে ঐতিহ্যের অংশীদার এই দুই দেশ, সেই ঐতিহ্যই তাঁদের স্ব স্ব দেশের জনগণের প্রতি সামাজিক ন্যায় বিচার ও সামঞ্জস্যর নীতি অনুসরণে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করছে।

এই বৈঠকে নেতৃদ্বয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁদের মত বিনিময় করেন এবং বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে যে উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব চলছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। উভয়েই এই আশা প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের অনুগত হয়েই মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি আসতে পারে। তাঁরা জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা আদায়ের ন্যায়-সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন জানান।

বিত্তবান এবং দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্যে নেতৃদ্বয় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা নতুন এবং ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক শৃঙ্খলার জন্য আন্দোলনের সমর্থন করেন।

ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকারূপে রাষ্ট্রসঙ্ঘের (জাতিসংঘের) ঘোষণার প্রতি নেতৃদ্বয় পুনরায় সমর্থন ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির এই সফরের ফলে উভয় দেশের মধ্যে আস্থা ও মৈত্রীর সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে নেতৃদ্বয় মনে করেন।